ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আদি ও মধ্যযুগ

ক্যালকাটা বুক হাউস

363
6.1.87

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ প্রবর্তিত নূতন পাঠক্রম (১৯৮৪-৮৬) অনুযায়ী লিখিত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

* একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য *

ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র, এম. এ., পি.-এইচ. ডি.,
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

১৯৮৪

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১-১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

891.4409
TUS

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 6.1.-87
Acc. No. 3638

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৪
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ছয় টাকা মাত্র

ভারত সরকার প্রদত্ত স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কাগজে মুদ্রিত

মুদ্রাকর ঃ
পাইওনিয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৭-এফ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

বাঁধাই ঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

নিবেদন

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের নূতন পাঠক্রম (১৯৮৪) অনুযায়ী লিখিত। পাঠক্রমটিকে যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যতালিকার বাইরে কোনো কবি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়নি; কারণ তাতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা হবে। সুতরাং মনসামঙ্গলের আদি কবি কানা হরি দত্ত, চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিক দত্ত, ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট অথবা অন্য কোনো পাঠক্রম-বহির্ভূত কবির সম্পর্কে আলোচনা এগ্রন্থে নেই।

গ্রন্থটি যেহেতু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, স্বভাবতই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ দুটি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আলোচনা অংশের কোনো উদ্ধৃতির উৎসের উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে তার উৎস এই দুটি গ্রন্থের যে কোনো একটি।

একটি যুগ অথবা একটি কালপর্ব সামাজিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত হয়। সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একথা অন্তত আংশিক সত্য; কারণ, কবিমানসও সমকাল দ্বারা অন্তত আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান পাঠক্রমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে। ফলত, বর্তমান আলোচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপট অভিপ্রেতপ্রাধান্য লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে শুধু সন তারিখের সংশয়। বর্তমান আলোচনায় অপ্রয়োজনীয় চিন্তা করে তার দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। স্বীকৃত মতটিকে মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (প্রাক্তন) ও অধ্যাপক এবং বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপর্ষদ প্রকাশিতব্য 'জাতীয় অভিধান'-এর প্রধান সম্পাদক ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভাগের সচিব ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র, পালি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দীপককুমার বড়ুয়া, বহরমপুর কে. এল. কলেজের অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা এবং মধ্য হাওড়া শিক্ষালয়ের শিক্ষক রোহিণীরঞ্জন চৌধুরীর উপদেশ ও পরামর্শ ঋণস্বীকারের অপেক্ষা না রাখলেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

এই সুযোগে ক্যালকাটা বুক হাউসের শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভাওয়াল, চঞ্চলকুমার ভাওয়াল, কৃপাসিন্ধু দাশ এবং নরেশ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদের জন্যে এই বইটি লেখা সেই উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৪

তুষারকান্তি মহাপাত্র

SYLLABUS—(Class XI & XII)
H.S. Examination—1986
History of Bengali Literature

আদিযুগ আদিযুগ ও মধ্যযুগ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০

১ বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ; বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন ও যুগবিভাগ ৩পৃ
২ বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ—চর্যাপদ ঃ সমাজচিত্র ও সাহিত্য সম্পদ। ৩পৃ

মধ্যযুগ

১ তুর্কী বিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা ৩পৃ
২ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী ৫পৃ
বি. দ্র.—চণ্ডীদাস সমস্যার বিষয় আলোচনার প্রয়োজন নেই।
৩ (ক) কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ। (খ) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়) ৩পৃ
৪ মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন ৪পৃ
৫ মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা। (বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ) ৪পৃ
৬ সাহিত্যে ও সমাজজীবনে চৈতন্যদেব ৪পৃ
৭ চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা। (দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরাম) ৩পৃ
৮ চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয় (চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) ৬পৃ
৯ বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলী ৫পৃ
১০ ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা—রূপরাম চক্রবর্তী (সংক্ষিপ্ত পরিচয়) প্রধানতঃ ঘনরাম চক্রবর্তী ৩পৃ
১১ কাশীরাম দাসের মহাভারত, সংক্ষেপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পরিচয় ৪পৃ
১২ আরাকান রাজসভায় প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা ঃ দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল ৩পৃ
১৩ ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল ৩পৃ
১৪ সামাজিক পটভূমিতে শাক্ত পদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত) এবং বাউল লালন ফকির ৪পৃ

বিষয়সূচি

আদি যুগ

প্রথম অধ্যায়

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব

দেশ ঃ

'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'। উত্তরে তার হিমালয়, পূর্বে ও পশ্চিমে কঠিন শৈলভূমি, দক্ষিণে সমুদ্র—মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ শ্যামল সমতলভূমি বঙ্গদেশ নামে খ্যাত। বঙ্গ নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও আছে, কিন্তু প্রাচীন যুগে সমগ্র বাংলা দেশের নাম বঙ্গ ছিল না ; বস্তুত কোনো বিশিষ্ট নামেই বর্তমান ভৌগোলিক সীমাটি পরিচিত ছিল না। বঙ্গ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ় ইত্যাদি নামে এক একটি জনপদ বা অঞ্চল অভিহিত হত। মুসলমান আমলেই 'সুবা বাংলা' অথবা 'বাঙ্গালা' নামে সমগ্র প্রদেশটি পরিচিত হল। পর্তুগীজদের কাছে ফারসী 'বঙ্গালহ্' একটু বিকৃত হয়ে দাঁড়াল 'বেঙ্গলা', যার থেকে ইংরেজরা 'বেঙ্গল' নামটি খুঁজে পেল। একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে 'গৌড়' নামেও অবশ্য দেশটি অভিহিত হত।

জাতি ঃ

কোন সুদূর কালে বাংলায় মনুষ্য বসতির সূচনা হয় সে সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। বাংলার ইতিহাস চতুর্থ দশকের আগে রচিত হয় নি। তবু কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, যার থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে সভ্যতার আদিযুগেও বাংলা দেশে জনবসতি ছিল।

আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্র দিয়েই পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে আদিযুগ, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। সে-যুগেরও পাথরের তৈরি নানা হাতিয়ার পাওয়া গেছে বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও বর্ধমানের নানা অঞ্চল থেকে। সুতরাং অনুমিত হয়, বাংলায় তখনো ছিল মানুষের বসবাস।

নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্র পালিশ করা। এযুগের মানুষ জানত আগুনের ব্যবহার। সুতরাং রন্ধনকৌশল যেমন আয়ত্ত ছিল তেমনি মাটি পুড়িয়ে বাসন তৈরির কৌশলও অজ্ঞাত ছিল না। ক্রমে তারা তামা (তাম্রযুগ) ও লোহার ব্যবহারও শিখেছিল। এই যুগের অস্ট্রিক ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী যারা 'নিষাদ' জাতি নামেও

পরিচিত, তারাই বাঙালীর পূর্বপুরুষ। কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, সাঁওতাল এবং হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল এদেরই বংশধর।

অস্ট্রিক ভাষাভাষীরা ছিল কৃষিজীবী এবং শিকারোপজীবী। ধান, কলা, লেবু, পাট, বেগুন ইত্যাদি বাঙালীর প্রিয় খাদ্য এবং তুলার চাষ বাংলা দেশে শুরু করেছিল এরাই।

নিষাদ জাতির পরে আসে দ্রাবিড় ও ব্রহ্মাতিব্বতীয় ভাষাভাষীরা। দ্রাবিড়রা নগরসভ্যতার সৃষ্টিকর্তা এবং বর্শা ছুরি ইত্যাদি লৌহ-নির্মিত অস্ত্র ও তামার রকমারি জিনিসের আবিষ্কর্তা। বাঙালীর নৃতত্ত্বে এই দুই ভাষা-গোষ্ঠীর প্রভাব আজও পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নি। তবে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অজয় কুনুর ও কোপাই নদের তীরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্ভবত, আর্য আগমনের (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০) আগেই এই সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল। অসম্ভব নয়, এই সভ্যতা দ্রাবিড়দেরই দান।

দ্রাবিড়ভাষীর পর এল আলপীয় আর্যরা। এরা আর্য হলেও বৈদিক আর্য বা নর্ডিক শাখা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ এরাই। ফলত, সমগ্র আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণেরা নর্ডিক শাখার বংশধর বলে দীর্ঘশির হলেও বাঙালী ব্রাহ্মণ প্রশস্ত-শির।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে অথবা তারও আগে বাঙালী তার স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা করেও যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদি উপলক্ষে বৈদিক আর্য অথবা 'নর্ডিক' শাখার সংস্পর্শে আসে। বাংলা ছাড়া সমগ্র আর্যাবর্তে ছিল তাদের বসবাস। বাংলাদেশে তাদের বসবাস নিষিদ্ধ হলেও রুদ্ধ হয় নি। বাংলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে (৪র্থ শতক) এই আগমন হল অবাধ। বাংলা ও বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘটল আর্যীভবন, বৈদিক আর্য-প্রভাব বাংলাদেশে দৃঢ়তর হল।

অস্ট্রিক ভাষাভাষীরা ছিল খর্বাকার। এদের নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রং কাল, মাথার চুল ঢেউ খেলানো। সাঁওতাল, লোধা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রাবিড়-ভাষী জনসমাজের গড়ন পাতলা, রং ময়লা এবং নাক ছোট। দক্ষিণ ভারতে এই গোষ্ঠীর লোক দেখা যায়। আলপীয় আর্যদের নাক লম্বা, রং ফর্সা, মুখ গোলাকার এবং উচ্চতা মধ্যম। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী এই গোষ্ঠীর লোক। নর্ডিক-আর্য দীর্ঘকায়, ফর্সা, সরু ও লম্বা নাকবিশিষ্ট। এরা যথেষ্ট বলিষ্ঠ। খ্রী· পূঃ পনের শ' অব্দের কাছাকাছি সময়ে এদেরই একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম ভারতে পঞ্চনদের তীরে এসে বসবাস করে। ক্রমে এরা সমগ্র আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়ে। ঋগ্বেদ রচনার কৃতিত্ব এদেরই। বাংলাদেশে এরা দীর্ঘকাল প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। একসময়ে এই প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। প্রবেশ

করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, নতুবা হত সমাজচ্যুত। কারণ, বাংলাদেশে তখন ছিল স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং স্বতন্ত্র ভাষা। অবশেষে গুপ্তযুগে আর্যাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা এসে বাংলায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। সেজন্যে তাঁদের জমিজমাও দান করা হয়েছিল। এভাবে ঘটল বাংলায় আর্যীভবন। এর আগে বাংলা দেশে বৃত্তিভিত্তিক চতুর্বর্ণ ছিল না। কিন্তু 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে'র সাক্ষ্যে জানা যায়, সেন আমলে বা তারও কিছু আগে বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের সৃষ্টি হয়। তিনভাবে এই জাতপ্রথা গড়ে ওঠে—পেশা, কর্ম ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগতভাবে। বর্তমান বাঙালী সমাজের জাতিবিন্যাস গড়ে উঠল এভাবে। সেইসঙ্গে জাতি ভেঙে বিভিন্ন 'জাতে'রও (কথায় বলে ছত্রিশ জাত) সৃষ্টি হল। পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অভিজাত ও অন্ত্যজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হল সমাজ।

জাতির পরিচয় নরতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের মতো ভাষাতত্ত্বের সাহায্যেও জানা যায়।

বাঙালীর কৃষি ও তার পদ্ধতি অস্ট্রিকভাষীদের দান। তাই বাঙালীর প্রিয় কৃষিসম্পদের নাম অস্ট্রিক ভাষা থেকেই আগত। ধান, তুলা, পান, হলুদ, নারকেল ও নানা জাতীয় সবজির সঙ্গে লাঙল, কার্পাস কম্বল সব শব্দের মূলে অস্ট্রিক শব্দ। কুড়ি, গণ্ডা ইত্যাদি সংখ্যাগণনারীতিও অস্ট্রিকভাষীদের কাছ থেকে পাওয়া। দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণরীতি বাংলাভাষায় প্রবেশলাভ করেছে। আর বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই তো সংস্কৃতমূল। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে বৈদিক আর্যদের দান অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত।

জাতির পরিচয় জানার আর একটি উপায় গ্রন্থাদির নানা উল্লেখ। বৈদিক আর্যরা মনে করতেন বঙ্গভূমি 'দেশোহনার্যনিবাসঃ'—অনার্যদের নিবাসস্থান। বাঙালীদের সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অবজ্ঞার। 'আচারঙ্গসূত্রে' মহাবীরের (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) এদেশে এসে বিপত্তিতে পড়ার কথা বলা হয়েছে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র ও বঙ্গ জনপদে কিছুকালের জন্য থাকলেও প্রায়শ্চিত্তের (ব্রাত্যষ্টোম) বিধান দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি স্বীকৃতি পেল। মনুসংহিতার কাল থেকে (খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীঃ ২০০-এর মধ্যে) বঙ্গদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭) 'গাঙ্গরিদাই' নামে এক সাহসী জাতির বঙ্গদেশে অবস্থানের কথা বলেছেন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' (অষ্টম শতক) বঙ্গবাসীকে বলা হয়েছে অসুর ভাষাভাষী।

'জনপ্রবাহ তো একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা ; তাহার ইতিহাস কোথাও শেষ হইয়া যায় না।' তবু প্রত্ন-নর-জন-সমাজ-ভাষাতত্ত্ব বিচারে ও নানা উল্লেখে জানা যায় যুগপ্রবাহের বিভিন্ন স্তরে অনু-আর্য ও আর্যের মিলনে বর্তমান বাঙালী জাতির

উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। আর্যীভবনের পরে তা স্পষ্টত দৃশ্য না হলেও বাঙালীর সে-পরিচয় গোপন থাকে নি।

বাংলা ভাষার উদ্ভব

ভাষা :

বাঙালীর মনের ভাব প্রকাশের ভাষা বাংলা ভাষা। বাঙালী জাতির উদ্ভব যুগপরম্পরায় কয়েকটি ভাষাগোষ্ঠীর লোকের মিলনে, বাংলা ভাষাতেও স্বভাবতই সেই ভাষাগুলির প্রভাব বর্তমান। তবে, আর্য-আগমণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা যেমন আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই বরণ করে নিয়েছিলেন, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও আর্যভাষাই হয়েছিল বাঙালীর ভাষা ; অষ্ট্রিক দ্রাবিড় ইত্যাদি ভাষাগুলি শব্দ ও ব্যাকরণরীতিতে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল মাত্র।

আর্যজাতি (নর্ডিক গোষ্ঠী) খ্রীস্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগে ইরান ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁদের বসতি ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবে। হাজার বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া সমগ্র আর্যাবর্তে তাঁদের বসতি বিস্তৃত হয়। এই আর্যরা রচনা করেন বেদ এবং বিভিন্ন উপনিষদ ও পুরাণ। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার এ স্তরটিকে বলা হয় আদি-ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo Aryan)। এ ভাষার কালসীমা খ্রীস্টপূর্ব পনের শতক থেকে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত।

তখনো লিপি আবিষ্কৃত হয়নি। সবই ছিল শ্রুতিনির্ভর। লিপি আবিষ্কারের পর এগুলি লিপিবদ্ধ হয় বলে এগুলিকে লেখ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

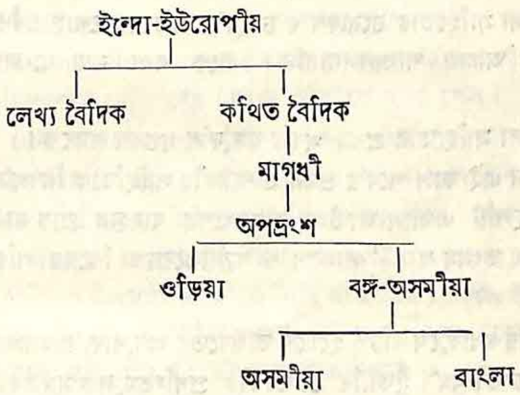
এই লেখ্য বৈদিকের সঙ্গে প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মুখের ভাষা 'কথিত বৈদিক'। এই কথিত বৈদিক ভাষা ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। তার ফলে সৃষ্টি হয় কয়েকটি প্রাকৃত ভাষার। মাগধী প্রাকৃত তাদেরই অন্যতম। প্রাকৃত ভাষাও ক্রমরূপান্তরের মধ্য দিয়ে অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি করে। প্রাকৃত ভাষার নাম অনুসারে অপভ্রংশ গুলিকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, মাগধী প্রাকৃত—মাগধী অপভ্রংশ ইত্যাদি। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই আর্যাবর্তের বিভিন্ন ভাষার জন্ম। বাংলাভাষার জননী মাগধী অপভ্রংশ।

ভাষার বিবর্তনের তিনটি স্তরকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :

প্রথম স্তর :	আদি ভারতীয় আর্যভাষা :	খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—খ্রীঃ পূঃ ৬০০
দ্বিতীয় স্তর :	মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা :	পালি—খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০
		প্রাকৃত—খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীঃ ৬০০
		অপভ্রংশ—খ্রীঃ ৬০০—খ্রীঃ ১০০০
তৃতীয় স্তর :	নব্যভারতীয় আর্যভাষা :	বাংলা ও অন্যান্য ভাষা—খ্রীঃ ১০০০—

বাংলা দেশে প্রথমে প্রচলিত ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আলপীয় আর্যশাখার ভাষা। কালক্রমে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের আগেই বণিক ও সাধুদের মাধ্যমে বাংলায় সংস্কৃত ভাষার প্রবেশলাভ ঘটল। চর্চাও চলল বিশেষ যত্নের সঙ্গে। পরবর্তীকালে আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে বাধাহীন আগমনের ফলে (খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে) এই চর্চায় আগ্রহ দেখা দিল অনেক বেশি পরিমাণে। বস্তুত, আর্যভাষাই হল বাঙালীর ভাষা, তা-ই ক্রমপরিবর্তিত হয়ে জন্ম নিল বাংলা ভাষা। আদিতে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষা ছিল অভিন্ন। কালক্রমে তারা আপন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে।

ভাষাস্তরকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে ঃ



সুতরাং, কথিত বৈদিক ভাষার আদি মধ্য ও নব্য তিনটি স্তরে ক্রমবিবর্তনের ফলেই জন্মলাভ করেছে আর্যাবর্তের অন্য সকল ভাষার মতোই বাঙালীর ভাষা, বাংলা ভাষা।

বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও যুগ-বিভাগ

কথিত বৈদিক ভাষার ক্রম-পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে খ্রীস্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে। বাঙালীর সৌভাগ্য ভাষার জন্ম লগ্নেই বাংলা-ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। তার ফলেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে দ্রুত।

ভাষাগত পরিবর্তনের সূত্র ধরে বাংলাভাষাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগ। আদিস্তরের কালসীমা দশম থেকে দ্বাদশ শতক,

মধ্যস্তরের ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক এবং অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে আধুনিক যুগের সূচনা।

আদিযুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত 'চর্যাগীতি' বা 'চর্যাপদ'। গীত বা পদ গান অর্থেই ব্যবহৃত। বাংলা ভাষা তখন সবেমাত্র মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাছাড়া শৌরসেনী অপভ্রংশ তখন বাংলা দেশের শিষ্ট সমাজে প্রচলিত। ফলে, চর্যার ভাষায় আছে অপভ্রংশ ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপটিকে তাই সহজে বাংলা বলে মনে হয় না। কিন্তু চর্যাগানের অনেক শব্দ বর্তমানেও প্রচলিত, যেমন—জান, নিল, গেল, করি, ছাড়ি, চড়িলে ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, বাতি, ঘরে ইত্যাদি বিশেষ্যপদ এবং দুই, বিনু, মাঝে ইত্যাদি পদ। চর্যার ভাষা যে বাংলা সে বিষয়ে তাই সন্দেহ থাকে না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন আজও পাওয়া যায়নি। একে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই কাল পর্বের প্রথম ও স্মরণীয় সাহিত্যিক নিদর্শন। বাংলা ভাষার বিবর্তনের রূপটি এখানে স্পষ্ট। অপভ্রংশের ব্যবহার প্রায় নাই, পরিবর্তে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ ; ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত হয়েছে ভাগবতের অনুবাদ, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, মনসা-চণ্ডী-ধর্ম ইত্যাদি দেবদেবীর প্রশস্তিমূলক মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-পদাবলী ও জীবনী সাহিত্য।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ মধ্যযুগের শেষ পর্যায়। বাংলা ভাষা তখন আধুনিক কালের কাছাকাছি। বৈষ্ণব ও পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদের সুবাদে প্রচুর পরিমাণে তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, ইসলামী সভ্যতার সঙ্গে মিশ্রণের ফলে ভাষায় এসেছে তুর্কী, আরবী, ফারসী ইত্যাদি শব্দের প্রচুর ব্যবহার। বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় বাংলা-মৈথিলী মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার ঘটেছে সাহিত্যে। অল্পস্বল্প পাশ্চাত্য শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনায় ঘটল গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব ও বিকাশ। ইংরেজি, ফরাসী ইত্যাদি পাশ্চাত্য শব্দসম্পদে পুষ্ট হল বাংলার শব্দভাণ্ডার। ব্যাকরণ, পদবিন্যাস, প্রবাদ-প্রবচনে পাশ্চাত্য ভাষার ছায়াপাত ঘটল। সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত রীতিতেও সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব দেখা দিল। সর্বোপরি ধর্ম ও সঙ্গীতের সীমিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে সাহিত্যের অঙ্গন প্রসারিত হল নানা দিকে—রচিত হল প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক এবং সনেট ইত্যাদি। পয়ারের ছন্দ-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নানা ছন্দ। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র,

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে বিশিষ্ট আসন সংগ্রহ করে বাঙালীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করল বিশ্বে। স্বাধীনতা লাভের লগ্নে দেশ বিভাগের ফলে বাংলাদেশ হল দ্বিখণ্ডিত। অভ্রচূড় বনস্পতি বাংলাসাহিত্য তবু তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে উনিশ শতকীয় বাঙালী মনীষীর নির্দেশিত পথেই, যার ভিত্তি উদার মানবপ্রেম।

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের সমকালে সামাজিক পটভূমি

বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব দশম থেকে দ্বাদশ এই দুই শতক জুড়ে বিস্তৃত। এই কালসীমায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশীয়েরা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজারা বাংলায় রাজত্ব করতেন। পাল যুগে বাংলাদেশে বর্তমান জাতিবিন্যাস দেখা দেয়নি, দেখা দিল সেন আমলে। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতা করায় সমাজশাসনে, রীতিনীতিপালনে ব্রাহ্মণদের বিধান অতিরিক্ত মূল্য পেল। কথিত আছে সেনরাজ বল্লাল সেন বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। ফলত, ব্রাহ্মণ সমাজ নূতনভাবে সংগঠিত হয়। এইসব কারণে বাংলাদেশে সেন আমলে নানা জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়। এই সময়ের কিছু পরে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' তার বিস্তৃত তালিকা আছে। সেনআমলে শুধু কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন-ই হয়নি, সমাজে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির স্থানও নির্দিষ্ট হয়েছে। ফলে উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর, অধমসংকর ইত্যাদি জাতিবিন্যাস দেখা গেল। আমাদের পূর্ববর্তী দান ছিল জাতিবিভাগ, তার সঙ্গে যুক্ত হল জাতপাত-বিচার।

সমাজের উচ্চবর্ণ অনুরক্ত ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি। তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল দুটি অবৈদিক লোকায়ত ধর্মের প্রভাব। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরিত শাখা সহজযান এবং শৈবপন্থী নাথধর্ম শুধু সমাজেই স্থান সংগ্রহ করল না, সাহিত্যরচনাতেও কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে রচিত সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত গান বা পদাবলী। নিজ ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা এই গানগুলি রচনা করেননি, কারণ ধর্মমতকে গোপন রাখাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সেজন্য গানগুলি রচনা করেছিলেন একটি সাংকেতিক ভাষায়, যার নাম সন্ধ্যা ভাষা।

সমাজ ব্যবস্থায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অথবা কবিসুলভ আন্তরিক প্রেরণাতেও গানগুলি রচিত হয়নি। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধকেরা নিগূঢ় সাধনপদ্ধতির কথা ব্যক্ত করতে

চেয়েছিলেন গানে। কিন্তু সেই সুযোগে বাঙালী সংস্কৃতির হয়েছে অকল্পনীয় উপকার। বাঙালী পেয়েছে বাংলা ভাষার আদি লগ্নের ভাষার নিদর্শন, সেই সঙ্গে সাধনপ্রক্রিয়া বর্ণনার আড়ালে তথ্যাভিত্তিক সমকালীন সমাজচিত্র। ধর্মভিত্তিক সাধন সঙ্গীত প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য। তারও সূচনা চর্যাগীতিতে। বাংলা সাহিত্য তার প্রকৃতির সন্ধান পেল সূচনালগ্নে—বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এ কম গৌরবের কারণ নয়, তার শুভ ফলও দেখা গেছে পরবর্তী সাহিত্যে।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নাথধর্মের প্রভাব বিস্তৃত থাকলেও তার সেকালের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এই সাহিত্য লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুখে মুখে যুগ পরম্পরায় আত্মরক্ষা করেছে, সেইসঙ্গে ভাষাগতভাবে পরিবর্তিতও হয়ে গেছে। [বস্তুত, 'মীনচেতন', গোরক্ষ বিজয়', 'গোর্খ বিজয়' 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' অথবা 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ভাষা বিচারে সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নয়]। কিন্তু দশম-দ্বাদশ শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নাথ ধর্মের গুরু গোরক্ষনাথের মহিমার কাহিনী প্রচলিত ছিল। সুতরাং অনুমিত হয়, বাংলা দেশের কাহিনীগুলিও সমকালে রচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ

চর্যাপদ ঃ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যা অর্থ আচরণ। চর্যাপদ বা গানগুলির মাধ্যমে সহজযান (মহাযান বৌদ্ধধর্মের শাখা বজ্রযানের অন্যতর শাখা) মতাবলম্বী গুরুরা অর্থ-গোপনীয়তার সাহায্যে নিজ সম্প্রদায়ের শিষ্যদের কাছে আচরণ বা সাধন-উপায় ব্যক্ত করেছেন। অর্থের গোপনীয়তার কারণ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিধর্মীদের সাধন-পদ্ধতি জানানোয় অনীহা।

চর্যাগান সাধন সংগীত। এতে আছে বৌদ্ধ সহজিয়াদের ভাবধারা ও যোগসাধনার পরিচয়। বাংলা ভাষা তখন সৃজ্যমান। সেই অপরিণত ভাষাস্তরে শৌরসেনী ও মাগধী অপভ্রংশের ছাপ আছে ভাষায়। তার উপর 'সন্ধ্যাভাষা' নামে একটি রহস্যময় হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় গানগুলি রচিত। সুতরাং গানগুলির অর্থ সহজে উদ্ধার সম্ভব নয়, অথবা সে-ভাষা আমাদের পরিচিত বাংলাভাষাও নয়। তবু বাংলা সাহিত্যের এই আদিস্তরে বাংলা ভাষার আদিরূপটি মূর্ত হয়েছে চর্যাগানে।

চর্যাগীতির একটি সংকলন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজের পুথিশালা থেকে এটি আবিষ্কার করেন ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। সংকলনটি একটি অনুলিখিত পুথি। সম্ভবত চতুর্দশ শতকে এটি নকল করা হয়। পুথিটি প্রাচীন বাংলা ও নেপালী অক্ষরে লিখিত। পুথিটিতে সর্বমোট পঞ্চাশটি পদ থাকার কথা। কিন্তু পুথি ছিন্ন হওয়ায় ছিচল্লিশটি পূর্ণপদ ও একটি খণ্ডিত পদ পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা ভাষাবিচার করে এগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। [ষাটের দশকে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে আরও ৯৮টি চর্যাপদ সংগ্রহ করেন যার অন্তত ১৯টি এইকালে রচিত বলে অনুমিত।] প্রতিটি পদের উপরে আছে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ। নিচে আছে বৌদ্ধ পণ্ডিত মুনিদত্ত-কৃত সংস্কৃত টীকা। চর্যার অর্থ উদ্ধারে এই টীকা বিশেষ সহায়ক।

পদগুলির রচয়িতা লুইপাদ, ভুসুকপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, শবরপাদ প্রমুখ চব্বিশ জন সিদ্ধাচার্য। এঁরা ছিলেন বাংলা, মিথিলা, উড়িষ্যা, কামরূপের অধিবাসী। সুতরাং চর্যাপদে আছে পূর্ব ভারতের সমকালীন জীবনচিত্র। কবিরা

ছদ্মনামই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁরা ছিলেন তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোক।

ফলে, চর্যায় যে জীবনচিত্র চিত্রিত তা মূলত অন্ত্যজ শ্রেণীরই। তবু তৎকালীন বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনযাপন-রীতির ইঙ্গিত গানগুলিতে লভ্য। সে-সমাজে ছিল ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। নিজের জমির আয় ও রাজানুগ্রহ ভোগ করতেন তাঁরা। অভিজাতেরা ছিল অর্থবান, অনভিজাত শ্রমজীবী মানুষ দারিদ্র্যপীড়িত। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে ধান ও তুলার চাষ হত। কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হত দৈনন্দিন জীবনের নানা উপকরণ। শিকারে জীবিকানির্বাহ করত শবরজাতির লোকেরা। যৌথ পরিবারে বিশ্বাসী ছিল সমাজ। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল, দারোগা-কাছারিও ছিল। বিবাহে যৌতুক গ্রহণ ও আড়ম্বর হত। নিম্নবর্ণের মধ্যে ছিল বিধবাবিবাহের প্রচলন। অবসর বিনোদনের উপায় ছিল দাবাখেলা, নৃত্যগীত ও অভিনয়। ব্রাহ্মণেরা বেদানুকূল ধর্মচর্চা করতেন—মন্ত্র-পূজা-জপতপ ছিল তাঁদের দেব-আরাধনার অঙ্গ। নিম্ন বর্ণের মধ্যে লোকায়ত ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—বৌদ্ধ সহজযানের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে তার পরিচয়।

চর্যাপদে চিত্রিত সমাজচিত্র:

নদীমাতৃক বাংলার চারদিকে খালবিল, 'বাম দাহিন জো খালবিখলা'। তাছাড়া কোথাও কোথাও আছে 'উঁচা উঁচা পাবত'। সেখানে বাস করে অস্পৃশ্য শবর জাতি। তাদের 'হাঁড়ীত ভাত নাহি'। তবু বাঙালী চিরকালই অতিথি পরায়ণ। সেজন্যই আছে নিত্য অতিথি সমাগম—'নিতি আবেশী'। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ধান যখন পাকে আনন্দের সীমা থাকে না বাঙালীর মনে— 'কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা'। আনন্দ প্রকাশের উপায় নাচ-গান-বাজনা—'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।' সাজসজ্জাতেও বাঙালীর বড় অনুরাগ। বস্ত্রের উপকরণ কাপাস তুলার অভাব নেই—'ঘুকড় এবেরে কপাসু ফুটিলা।' জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণদের চিন্তা কম। তাম্রশাসন ('শাসনপড়া') দ্বারা রাজা তাদের নিষ্কর জমি ভোগের সুযোগ দেন। হরি, ব্রহ্মা, আগম-পুথিপাঠ নিয়ে কাটে তাদের সময়। কিন্তু আছে চোর ডাকাতের ভয়—'অদঅ বঙ্গালে লুড়িউ', 'চৌকিড় ভণ্ডার মোর লইআ সেস।' ডাকাত ছাড়া আছে চোর—'কানেট চোরে নিল অধরাতী'। অবশ্য চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে ছিল প্রহরী 'তথতা পহারী'। তালাচাবিরও ব্যবস্থা ছিল—'কোঞ্চা তাল'। আর ছিল দারোগা—'দুষাধী', থানা ছিল, কাছারিও—'উআরি'। সর্বোপরি ছিল সুখী দাম্পত্য জীবন—'জোইনি জালে রজনী পোহাঅ'।

চর্যাগীতি ধর্ম-সংগীত—যে ধর্মে বলা হয়েছে জীবন ও জগৎ অসার, অলীক, মায়া, মিথ্যা। চর্যা-রচয়িতা বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য এ-জগতকে ভালবাসতে পারেননি।

জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তিই ছিল তাঁদের কামনা। সুতরাং জীবনানুরাগ অথবা জগৎ-প্রীতি তাঁদের রচনায় আশা করা অনুচিত। কিন্তু তত্ত্বকথাকে তাঁদের রূপ দিতে হয়েছে এই তথাকথিত অস্তিত্বহীন জীবনের উপমানে। ফলত, সমাজ-চিত্র ও সাহিত্যসম্পদ সেখানে উদ্দেশ্য না হয়েও অদৃশ্য থাকেনি।

চর্যাপদে ডোম, শবর, চণ্ডাল, কাপালিক ইত্যাদি নিম্নবর্ণের লোকের কথাই বেশি। ব্রাহ্মণেরা তাদের অস্পৃশ্য মনে করত। ডোমেরা থাকত গ্রাম বা নগরের বাইরে, তাদের বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, ঝুড়ি-চুপড়ি তৈরি ও খেয়া পারাপার। নৃত্যে তারা ছিল বিশেষ পারদর্শী। শবরেরা পাহাড়ে, বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, পশু শিকারে অভ্যস্ত ছিল। গলায় গুঞ্জাফলের মালা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ ও কানে বজ্রকুণ্ডল ধারণ ছিল তাদের বিলাস। সঙ্গীতে তারাও পারদর্শী ছিল। কাপালিকদের স্থান ছিল সবার নিচে। তারা নরকঙ্কালের মালা পরে নগ্ন অবস্থায় ঘুরেবেড়াত।

অন্ত্যজ শ্রেণীর বৃত্তির মধ্যে ছিল ধান ও তুলার চাষ, কাপড় বোনা, মদ তৈরি, কাঠের কাজ। অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকেরা ছিল শ্রমজীবী, কায়িক শ্রমই ছিল তাদের সম্পদ। শ্রমের বিনিময়ে জুটত না উপযুক্ত অর্থ। সুতরাং অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন-যাপনও ছিল অনুন্নত। অন্যপক্ষে, ব্রাহ্মণেরা রাজানুগ্রহে নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করত, সোনা রূপাও দান হিসাবে পেত। তাদের বৃত্তি ছিল বেদানুকূল শাস্ত্রচর্চা। ফলে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হত না, অর্থেরও অভাব ছিল না। সেই সমাজে চোর-ডাকাতের উপদ্রব অজানা ছিল না, সেজন্য তালাচাবি, প্রহরী, দারোগা ও কাছারির ব্যবস্থাও ছিল।

শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ, শালী-স্ত্রী-ছেলের বৌ নিয়ে ছিল সেকালের যৌথ পরিবার, সেখানে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের সুযোগ ছিল না। বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল এ-কালের মতোই। বিবাহে যৌতুক গ্রহণ করা হত, নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল। অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় ছিল দাবা খেলা, নাচগান ও অভিনয়।

চর্যায় সাহিত্য সম্পদ ঃ

বৈচিত্র্যময় জীবনের খণ্ডচিত্রই চর্যায় লভ্য। সে চিত্রে যেমন আছে সমাজ-পরিচয় তেমনি আছে সাহিত্যসম্পদ। চর্যাগানে প্রধানত জীবনের দুটি অনুভবের প্রকাশ— বিষাদ ও শৃঙ্গার। নিসর্গপ্রীতিও অলক্ষ্য থাকেনি।

বিষাদবোধ ফুটে উঠেছে সামাজিক অভাব, অত্যাচার ও অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

লোকালয়ে বাস অথচ নাই প্রতিবেশী। ঘরে নাই অন্ন অথচ অতিথির নিত্য সমাগম। একটি গানে বলা হয়েছে নির্দয় জলদস্যু দেশ লুণ্ঠন করল, নিজের গৃহিণীকে অপহরণ করল চণ্ডাল। আগে পরিবার নিয়ে ছিলাম মহাসুখে ; এখন সোনারূপা কিছুই থাকল না—'জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ'—এখন মরা বাঁচা দুইই সমান।

শৃঙ্গারের প্রকাশ প্রধানত গুণ্ডরীপাদ ও শবর পাদের রচনায়। শবরপাদ প্রেমিকার রূপবর্ণনায় বলেছেন 'মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী'—শবরীর পরণে ময়ূরের পালক, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা, তাকে দেখে—'উমতো শবরো'—শবর উন্মত্ত।

নিসর্গসৌন্দর্য চর্যাগানে প্রাধান্য না পেলেও সুচিত্রিত। 'নানা তরুবর মউলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী'—নানা তরুবর মুকুলিত, তাদের পুষ্পিত শাখা আকাশে লেগেছে ; অথবা

তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহা বাড়ী উএলা।
ফিটোল অন্ধারিরে আকাশ ফুলিআ ॥

সেই বাড়ির পাশের জ্যোৎস্নায় বাড়ি উজ্জ্বল, অন্ধকার কেটে যাওয়ায় মনে হচ্ছে আকাশ জুড়ে ফুল ফুটেছে। এ তো যেন সাধনসঙ্গীত নয়, কোনো কবিমনের অন্তরঙ্গ প্রকাশ। এই পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাকা কঙ্গুচিনা ধানের ঘ্রাণ, তাতে মিলনমত্ত হয়েছে শবর-শবরী—এ চিত্রে 'সন্ধ্যাভাষা'র রহস্যময়তার অন্তরাল ভেদ করে বেরিয়ে আসে জীবন-রহস্য—সাহিত্য-সম্পদ।

বিষাদ, নিসর্গ ও প্রেম—রোম্যান্টিক কবিতা তথা বাংলা কবিতার তিন মুখ্য উপাদান—চর্যাগানকেও সাহিত্যসম্পদে ভরিয়ে তুলেছে। বস্তুত চর্যার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবলগ্নেই বাংলা সাহিত্যের মূল প্রকৃতিটি পরিস্ফুট হতে পেরেছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির প্রধান কারণ এই শৈশবে আত্ম-আবিষ্কার।

পদকর্তারা নানা প্রকার নিগূঢ় তান্ত্রিক ধর্মাচরণের কথা বলেছেন গানগুলিতে এবং সেটিই ছিল গীত রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তারই ফাঁকে পাওয়া গেছে তাঁদের কবিপ্রতিভা, ছন্দ ও রূপনির্মাণ পদ্ধতির পরিচয়। বাংলার বিশিষ্ট ছন্দ এবং প্রাক-আধুনিক যুগের কবিতায় সর্বত্র ব্যবহৃত ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদীর আদি নিদর্শন পাওয়া যায় পদগুলিতে। নির্বাণতত্ত্বকে অনেক পদে দয়িতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যেও দয়িত-দয়িতার রূপক বিশেষ মর্যাদা পায়।

সুতরাং চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি-সাহিত্যের পরিচয়ই শুধু নয়, বাংলা কাব্য-রীতিরও পরিচয়। কামলিপাদের একটি গানে আছে—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রুপা থোই নহিকে ঠাবী॥ (৮ নং চর্যা)

করুণারূপ নৌকা সোনায় ভর্তি, রূপা রাখার স্থান নাই—শূন্যতা-জ্ঞানে (সোনা) করুণা নৌকা পূর্ণ, ইন্দ্রিয় জগতের মিথ্যা জ্ঞান (রূপা) রাখার জায়গা নাই সেখানে। একথা হয়ত নির্বাণতত্ত্ব সম্পর্কে সত্য ; কিন্তু চর্যাগানে আমরা পাই সহজযানের ধর্ম-দর্শন-সাধনরীতিরূপ সোনার সঙ্গে দৃশ্যমান রূপ-জগতের রূপকায়িত পরিচয়ও।'

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজির 'নদীয়া' জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। ইতিপূর্বে আর্যাবর্তের অন্য অংশে 'শক হূণদল পাঠান মোগলে'র প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলা দেশ ব্যতিক্রম হিসাবেই আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনৈক শেখ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ হলেও ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে প্রচার অথবা প্রসার লাভ করেনি। তুর্কী বিজয় আর্বিভবনের পরে বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক বিরাট রূপান্তরের সূচনা করল, যা কেবল আর্য ও ইংরেজ আগমনের প্রভাবের সঙ্গেই তুলনীয়।

তুর্কী আক্রমণের সামগ্রিক ফলাফল বিচার করে তুর্কী আমলকে 'তামস যুগ' (The Dark Age) নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত শাসককুলের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক হত্যালীলা, নৃশংসতা, ধর্মান্ধতা, পরধর্ম বিদ্বেষ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্নগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার উদগ্র প্রবৃত্তি সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর যে আঘাত হেনেছিল তাতে বাংলার জীবন-আকাশ পূর্ণ তমসাবৃতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে এই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়ে নবযুগের ঊষাকিরণপাতও সম্ভব হয়েছিল। 'রাত্রির তপস্যা' ঈপ্সিত দিনের শুভ সূচনা না করলেও নবদিবসের আরম্ভ সূচিত করেছিল।

যে ঘৃণ্য চক্রান্তে রাজপ্রাসাদ কলুষিত ছিল তার বিষবাষ্প অবশ্য প্রাসাদের বাইরে সাধারণ জনজীবনে বিশেষ কোনো ছায়াপাত করতে পারেনি। রাজশক্তির সঙ্গে জনজীবনের বিচ্ছিন্নতার জন্য সমাজ ছিল এই নৃশংস পাশবিকতার মূক সাক্ষী মাত্র। সুতরাং সে-ইতিহাস শুধু রাজার ইতিহাস, বৃহত্তর বাঙালী সমাজের পরিচয় তাতে নেই।

এতকাল বাঙালী ছিল স্বাধীন, কিন্তু আপন সীমায় বদ্ধ। তুর্কী শাসকের অতিরিক্ত ক্ষমতার লোভ ও অর্থলোলুপতা এবং স্বাধীন রাজা হওয়ার বাসনা দিল্লির সম্রাটের দৃষ্টি এই প্রান্তীয় রাজ্যটির উপর নিপতিত করল। দিল্লির সম্রাটের সঙ্গে বিবাদে ও যুদ্ধের পরিণামে বাঙালী জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি রাষ্ট্রনৈতিকভাবে ভারতীয় জনজীবনের বৃহৎ পরিসরের অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

প্রাক্-তুর্কী আক্রমণকালে বাঙালী ধর্মপ্রাণ, কৃষিনির্ভর জাতি হিসাবে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছিল। সে-সমাজে দারিদ্র্য হয়ত ছিল, কিন্তু অভাব-অনটনের তীব্রতা ছিল না। বাংলার কৃষিজ সম্পদও শিল্পজাত দ্রব্য বরং বাঙালীকে সুখের মুখই দেখিয়েছিল। তুর্কী আক্রমণের পরে ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে যোগসূত্রে বাংলার অর্থনীতিতে নূতন দিক সূচিত হল। বাংলার কৃষিজ, শিল্পজাত সম্পদ (বিশেষভাবে রেশমী কাপড়, কাগজ ইত্যাদি) বাংলার বাইরে বিক্রীত হয়ে অর্থাগমের নবদিগন্ত উন্মোচন করল। কিন্তু এর ফলে বাঙালী শুধু লাভবানই হতে পারেনি। বাঙালীর অর্থ শাসকশ্রেণীর দ্বারা বাংলার বাইরেও প্রেরিত হল। যুদ্ধবিগ্রহে অর্থনাশ ছাড়া দিল্লির সুলতানের বশ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপও বাংলার অর্থ দিল্লির সুলতানের কোষাগারে জমা পড়ল। ইলতুৎমিসের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ খিলজির যুদ্ধের পরিণামে জরিমানা স্বরূপ আশি লক্ষ টাকা দিল্লির সুলতানকে দিতে হয়। ফলত অর্থাগম ও অর্থক্ষতি দুয়েরেই কারণ হয়েছিল তুর্কী আক্রমণ ও শাসন। তথাপি বাংলাদেশ সেকালে ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। মার্কোপোলো (১৩শ শতকে বাংলায় আসেন) এবং ইবনে বতুতার (১৪শ শতকে আসেন) বিবরণ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বতুতার তথ্য কল্পিত নয়। তিনি জানিয়েছেন তৎকালে সাত টাকায় ২৮ মণ ধান বা প্রায় ৯ মণ চাল, সাড়ে তিন টাকায় ১৪ সের ঘি, অথবা ১৪ সের চিনি পাওয়া যেত। এই তথ্য বাঙালীর সচ্ছলতারই নিদর্শন।

তুর্কী আক্রমণের ফলে গ্রাম-নির্ভর বাঙালী সমাজে নগরের সূত্রপাত ঘটল। রাজ্যশাসনকে কেন্দ্র করে, ব্যবসার কেন্দ্ররূপে বর্ধিষ্ণু গ্রাম গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, তাণ্ডা, দেবকোট, পাণ্ডুয়া ইত্যাদি নগরে পরিণত হল।

তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালী সমাজ নবভাবে গঠিত হল। তুর্কী শাসকের আমন্ত্রণে পীর, ফকির, আউলিয়া, মুরশিদ ইত্যাদি ধর্মগুরুরা বাংলা দেশে এলেন। প্রলোভন ও উৎপীড়ন দুই পদ্ধতিতেই তাঁরা হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন। হিন্দু সমাজের অনুদার নীতিও এব্যাপারে তাঁদের কম সহযোগিতা করেনি। অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করে বাঙালীর এক বৃহৎ গোষ্ঠীর জন্য ইতিপূর্বেই মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করা হয়েছিল। তাছাড়া বৌদ্ধরাও ব্রাহ্মণদের হাতে কম উৎপীড়িত হন নি। ফলত এই দুটি বাঙালীগোষ্ঠী দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হয়ে সামাজিক বিন্যাসের নূতন দিক সূচিত করল। ইসলাম ধর্মের প্রসারে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মমত বাংলাদেশের প্রধান দুই ধর্মমতে পরিণত হল। শাসককুলের দ্বারা আমন্ত্রিত পীর, ফকির, দরবেশ সম্প্রদায় এবং ধর্মান্তরিত হিন্দু অর্থাৎ নব মুসলমানরা মিশে বাংলাদেশে সংখ্যাগতভাবে উল্লেখযোগ্য একটি মুসলমান সম্প্রদায় সৃষ্টি করল।

তুর্কী আগমনের প্রথম পর্যায়ে হিন্দু নিধন ও নির্যাতনই ছিল শাসকদের লক্ষ্য।

সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ভেদরেখা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যোগ্য ব্যাক্তিকে রাজকার্যে নিযুক্ত করায় সামাজিক এই বিভেদের রেখা অনেকটা দূরীভূত হয়।

তুর্কী আক্রমণের ফলে প্রধানত তিনটি কারণে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। তুর্কী আক্রমণকে বাঙালী তার পাপের ফল হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। হিন্দুর কর্মদোষে যবনরূপী কল্কিঅবতার তাকে শাস্তি দিতে আবির্ভূত হয়েছেন, এই ছিল তার ধারণা। সুতরাং 'ধর্ম হইল যবনরূপী' অথবা 'ব্রহ্মা হৈলা মহম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেগম্বর' চিন্তা করতে সে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় নি। এই মানসিক প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও সংস্কারপ্রবণতা। যে দেবমন্দির মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে হিন্দুরা পূর্বতন সংস্কারবশে সেখানেই শিরনি দিত। এতে যেমন মুসলমান ধর্মের প্রতি তারা আকৃষ্ট হত, তেমনি সেই মসজিদের পাশে বসা ফকিরদের নানা তুকতাক, তাবিজ, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি তাদের ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়াত। তাছাড়া ফকিররা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নানা গল্প কাহিনীকে মুসলমানী রূপ দিয়ে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মের প্রতি অনুরক্ত করে তুলত। ফলে পরবর্তীকালে সত্যপীরের সত্যনারায়ণ হয়ে ওঠার পথে সকল বাধা আস্তে আস্তে, দূর হয়ে গেল।

তুর্কী আক্রমণের কালে বাঙালী ছিল অলস, শান্তিপ্রিয়, ধর্মপ্রাণ একটি জাতি।

গুপ্ত রাজাদের আমল থেকে শাস্ত্রবিধি বাংলা দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার আগেও এদেশে ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু বৈদিক ধর্মাচরণ প্রচলিত ছিল না। নবাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শাসকশ্রেণীর আনুকূল্যে বাংলাদেশে সমাজপতির আসন গ্রহণ করেছিল, আর পুরনো ব্রাহ্মণেরা বর্ণব্রাহ্মণে অথবা ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। লোকায়ত ধর্ম ছিল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ সামাজিক ব্যাপার এবং প্রধানত নিম্নবর্ণের বাঙালীর ধর্মচর্চার উৎস। ফলে তুর্কী আক্রমণের কালে বাংলাদেশে প্রধানত চারটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল: প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারী ধর্ম (প্রাক-আর্যযুগ থেকে নব-গৃহীত নানা দেবদেবী এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত), বৌদ্ধ-মহাযান ধর্মের রূপান্তর সহজিয়া ধর্মমত, নাথধর্ম ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম (বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী এই ধর্মমতের প্রধান দেব-দেবী)। তুর্কী আক্রমণের দু-তিন শতকের মধ্যেই চারটি ধারা পৌরাণিক ও অপৌরাণিক (অর্থাৎ লোকায়ত) এই দুটি ধারায় পরিণত হল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আবার এই উভয়বিধ ধারার দেবদেবী স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও অভিন্ন বলে পরিগণিত হলেন। চণ্ডী ও দুর্গা, ভাঙড় ভোলানাথ ও মহাদেবের মিলন ঘটল এভাবে।

'যত মত তত পথের' প্রবক্তা রামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন উনিশ শতকে, কিন্তু প্রাক্-দ্বাদশ বাঙালী সমাজে এই নীতিরই অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। যদিও বৈদিক

ব্রাহ্মণেরা অবৈদিক ধর্মাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন না কিন্তু সমাজের বৃহত্তর অংশে বৌদ্ধ, জৈন বা নাথধর্ম গ্রহণের কোনো বাধানিষেধ ছিল না। একই পরিবারে একাধিক ধর্মপালন দূষণীয় ছিল না, স্বামী-স্ত্রীর পৃথক ধর্মাবলম্বী হওয়াতেও বাধা ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল তুর্কী আক্রমণের পরে। বৌদ্ধ ও লোকায়ত দেবদেবী হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গেই সমীকৃত হয়ে গ্রামের দেবদেবীরূপে সর্বসাধারণের দ্বারা পূজিত হলেন। বিভিন্ন দেবদেবীর মিশ্রণ তুর্কী আক্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি। মনসা, শীতলা ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব এভাবেই সম্ভব হল।

মন্দির যখন মসজিদে পরিণত, হিন্দু বিস্মৃত হতে পারেনি তার পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কারকে। নবীকৃত মসজিদেই সে দিয়েছে শিরনি, যেখানে আল্লার নাম স্মরণ করেছেন মুসলমান ভক্ত। ফলে উচ্চ শ্রেণীর ধর্মীবিবাদ উপেক্ষিত হয়ে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছে বৃহত্তর জনমানসে। পরবর্তীকালে হিন্দুর দ্বারা পীরপয়গম্বরের আরাধনার শুভ সূচনা এভাবেই সম্ভব হয়েছিল।

মন্দির লুণ্ঠন করে মসজিদ বানানো, হিন্দুধর্মগ্রন্থ নষ্ট করা ছিল তুর্কী আক্রমণের প্রাথমিক পরিণাম। তারপর মুসলমান শাসক অনুভব করেছে ধর্মান্ধতা নয়, ধর্মের প্রতি উদারতাই রাজার ধর্ম এবং নিরাপদ রাজ্যসুখের উপায়। অনেকে আবার পুরাণের ঐশ্বর্যময় কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে মুসলমান রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে অনূদিত হল হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণকথা। সামসুদ্দিন, জালালুদ্দিন ও রুকনুদ্দিন বারবক শাহের নাম সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছে। শেষোক্তজনের আনুকূল্যে গুণরাজ খান মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। 'পরাগলী মহাভারত' পরাগল খাঁর উদারতা ও সাহিত্যস্পৃহারই নিদর্শন বহন করে। ছুটি খাঁর উৎসাহেই শ্রীকরনন্দী অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মুসলমান শাসক দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে।

তুর্কী আগমন ও শাসনের ফলে বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটল। তুর্কী রাজন্যবর্গের ভাষা ছিল ফারসী। রাজভাষা হিসাবে ফারসী ভাষা বাংলা ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করল। বস্তুত ইংরেজ শাসনের সূত্রে ইংরেজি ভাষার প্রভাব যদি বাংলা ভাষায় দেখা না দিত তবে হয়ত সাত শতকের বাংলা-ফারসীর সান্নিধ্যের ফলে 'বাংলা ভাষাকে উরদু ভাষার ভগিনীরূপেই' পাওয়া যেত।

অবশ্য, বাঙালী মন তুর্কী অপশাসন ও ধর্মান্ধতাকে সহজ মনে মেনে নিতে পারেনি। যে বিরূপতা ক্ষমতার অভাবে জীবনে বা বাস্তবে দেখা দেয়নি, তারই প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তুর্কী শাসকের অত্যাচারকে কটাক্ষ করা হয়েছে। মুসলমান শাসকের ধর্মের ব্যাভিচার বাঙালী অন্তঃকরণের গভীরে যে বেদনার ছায়াপাত ঘটিয়েছিল তারও প্রমাণ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date....6-1-87.........
Acc. No...3638..........
S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

দ্বিতীয় অধ্যায়

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। বাংলাভাষায় কৃষ্ণকথা নিয়ে রচিত প্রথম কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল পুঁথি পাওয়া যায়নি, অনুলিখিত যে একটিমাত্র পুঁথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তা-ও খণ্ডিত—আদি এবং অন্ত ও মধ্যের কয়েকটি পাতা নাই। তেরটি খণ্ডে বিভক্ত এই কাব্যের খণ্ডিত সহ মোট চারশ আঠারটি পদ বা গান পাওয়া গেছে। প্রতিটি পদের উপরে রাগের উল্লেখ আছে। মুখ্য চরিত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। গৌণ চরিত্রও তিনটি—যশোদা, আয়ান ঘোষ ও তার মা। কাহিনীর বিস্তার কৃষ্ণ-রাধার জন্ম থেকে কৃষ্ণের দ্বারকায় গমনহেতু রাধাবিরহ পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখ্য তিন চরিত্রের গীতবদ্ধ কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেজন্যে কাব্যটিকে অনেকে নাট্যগীতির মর্যাদা দান করেন।

বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ। তিনি কাহিনীসূত্রের সন্ধান করেছেন ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি পুরাণ ও জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দে'র মধ্যে। কিন্তু শুধু সেগুলির উপর নির্ভর না করে তিনি প্রচলিত লোককথা, লোকগাথাকেও কাহিনীতে গ্রহণ করেছেন; বরং একটু অধিক পরিমাণে। ফলত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়পরবশ গোঁয়ার রাখাল—নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোনো পন্থাকেই সে অনুচিত মনে করে না। তার আকর্ষণ রাধার প্রতি, এগার বছর বয়সেই যে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না এবং সামাজিক ঔচিত্য সম্পর্কে সচেতন। সে যখন কৃষ্ণের বুদ্ধির কাছে পরাজিতা, প্রেমের রহস্যে কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলা—সমাজ-সংসার তুচ্ছ করে যোগিনী বেশেও কৃষ্ণসান্নিধ্যে অনুরাগিণী। বস্তুত, এ কাব্যে কবি প্রেমের সমস্ত দিকই উপস্থিত করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমের আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে স্থান দিয়েছেন প্রেমের বাস্তবতাকে। ফলে মনে হতে পারে কাব্যটি অশ্লীল; কিন্তু যুগের কথা চিন্তা করলে, বিশেষ, রাধাপ্রেমের ব্যাকুলতা চিত্রণে কবির আশ্চর্য দক্ষতার কথা মনে রাখলে কাব্যটির সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করার উপায় নাই। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই কৃষ্ণপ্রেম বিভোরতাকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন; এ কৃতিত্বও কম নয়। সেজন্য চৈতন্য নিজেও ছিলেন এ-কাব্যের বিশেষ অনুরক্ত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বাঁকুড়ার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে। ভনিতা থেকে কবির নাম জানা গেলেও আদ্যন্ত না

থাকায় পুথির নাম বা রচনাকাল জানা যায় না। ইতিপূর্বে চৈতন্যজীবনচরিত কাব্য থেকে জানা গিয়েছিল চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক কাব্যের অংশবিশেষ পছন্দ করতেন। সেই সূত্র ধরে বসন্তরঞ্জন এই কাব্যটিকেই উল্লিখিত কাব্য ধরে নিয়ে সম্পাদন ও প্রকাশের সময় (১৯১৬) নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'। কাব্যটির ভাষা ও শব্দ এবং পুথিটির লিপি ও কাগজ বিচার করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কাব্যটি রচিত হয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এবং পুথিটির অনুলিখনের কাল ষোড়শ শতক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুথিটিতে কাব্যটির কোনো নামোল্লেখ নাই। তবে পুথিটির মধ্যে প্রাপ্ত একটি চিরকুটে (যেখানে পুথিটির কয়েকটি পাতা ধার নেওয়া ও ফেরত দেওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধ) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) নামটি উল্লিখিত। সুতরাং কাব্যটির প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' হওয়াও অসম্ভব নয়।

প্রেম-আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যটিতে সমসাময়িক জীবনচিত্রও ধরা পড়েছে। সামাজিক নীতিবোধ, সংস্কার ও আচার, পালনীয় রীতিনীতি, ঘাটিয়ালের দৌরাত্ম্য, গোয়ালা-জীবন, আত্মীয়তাবন্ধনের রীতি, বেশ-অলংকার-রন্ধনপ্রক্রিয়া, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি জীবনের খুঁটিনাটি ইতস্তত প্রকাশ পেয়েছে কাহিনীর মধ্যে। তার দ্বারা সে যুগের একটি সামগ্রিক জীবন-ছবি হয়তো ফুটে উঠে না, কিন্তু পাওয়া যায় তার অনেক রসদ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি মধ্যযুগের বাংলাভাষার একটি প্রামাণিক দলিল। চর্যাপদের পর (দ্বাদশ শতক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা ভাষার পরিবর্তনের ধারাটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। চর্যার ভাষা যে বাংলা সে কেবল পণ্ডিত ও গবেষকেরই বোধগম্য। বাংলা ভাষার প্রকৃতি তার প্রবাদপ্রবচন সমেত পরিস্ফুট হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।

চর্যার ভাষায় ছিল অপভ্রংশের প্রভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। অনেক ক্ষেত্রে সে-ভাষা ষোড়শ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত বৈষ্ণব কবিদের রচনার মতোই দৃঢ়োপনিদ্ধ ঃ

তীনভুবনজন মোহিনী

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রকৃত গৌরব রাধাচরিত্রের বিকাশে, তার মনোভঙ্গির ক্রমবিবর্তনের প্রকাশে। কাব্যটির আরম্ভে রাধা ছিল কৃষ্ণের প্রতি বিতৃষ্ণ। তার বিতৃষ্ণা ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে অনুরাগে পরিণত হল। কৃষ্ণের ক্ষণবিচ্ছেদেও তখন

তার অন্তরে দেখা দেয় বিরহের হাহাকার। কবি তার দুঃখার্তিকে অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাও নিশিবোঁ আপনা ॥

কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার রান্না নষ্ট হয়েছে, আকুল হয়েছে তার প্রাণ। যে-ভাষায় কবি তার মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন তা যে কোন সাহিত্যের পক্ষেই গৌরব।

পদাবলী

পদ অর্থে গান। পদ শব্দের ব্যবহার আছে কালিদাসের মেঘদূতে। জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দে গানকে বলা হয়েছে 'পদম্'। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে-সব গান রচিত হয় তার সাধারণ নাম পদ এবং পদের সমষ্টি পদাবলী—যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী। এইসব পদ প্রধানত গান হলেও কাব্য ও শিল্পরীতির উৎকর্ষে সাহিত্য পদবাচ্য-ও। তাই বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সেগুলির স্থান অপরিহার্য।

বিদ্যাপতি ঃ

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী, তিনি তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলীতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদরচনা করেন। মিথিলা তখন ন্যায়শাস্ত্র চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। যে-সব বাঙালী ন্যায়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে মিথিলায় যেত তাদের দ্বারাই বিদ্যাপতির পদ বাংলাদেশে সুপরিচিত হয়। কিন্তু লিখিত রূপে না এসে এগুলি এসেছিল কণ্ঠস্থ হয়ে। ফলে কালক্রমে পদগুলিতে বাংলা ভাষা মিশ্রিত হয়ে যায়। এই মৈথিলী বাংলা মিশ্রিত ভাষার নাম ব্রজবুলি। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদের মধ্যে এই মিশ্রিত ভাষার লক্ষণ দেখা যায়।

বিদ্যাপতির জন্ম বিহারের মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী নামক গ্রামে। তিনি এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। তাঁর পূর্বপুরুষেরা মিথিলা রাজবংশের সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত ছিলেন, কেউ ছিলেন সভাপণ্ডিত, কেউ সেনাপতি। বিদ্যাপতির জন্মকাল সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে অন্য সূত্র থেকে জানা যায়, চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ থেকে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ছিল তাঁর জীবনকাল। সম্ভবত ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের অল্প কিছু পরে তাঁর তিরোধান ঘটে। বিদ্যাপতি সংস্কৃত কাব্য, অলংকার ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিথিলার একাধিক রাজার সভাকবির পদও অলংকৃত

করেন। কুলধর্মে কবি ছিলেন শৈব ; কিন্তু শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সব ধর্মের প্রতিই ছিল তাঁর সমদর্শিতা। সংস্কৃত, অবহট্‌ট, মৈথিলী ভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদরচয়িতা হিসাবেই তিনি সমাদৃত, কিন্তু মিথিলায় তাঁর খ্যাতি ন্যায়-স্মৃতি ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত এবং স্মৃতিসংহিতার রচয়িতা হিসাবেও।

বিদ্যাপতির মাতৃভাষা মৈথিলী, সংস্কৃত ও অবহট্‌টে সাহিত্য রচনা করেন। বাংলাভাষায় তাঁর কোনো পদ না থাকা সত্ত্বেও বাংলা দেশেই কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। তার কারণ, মৈথিলী ভাষায় রচিত তাঁর সুললিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে মিথিলায় গিয়ে বাঙালী ছাত্র অধ্যয়নসমাপনে দেশে ফিরত ন্যায়বিদ্যার সঙ্গে কণ্ঠে নিয়ে বিদ্যাপতির পদ। এভাবে বাঙালী পরিচিত হল তাঁর অপূর্ব কবিপ্রতিভার সঙ্গে। শ্রীচৈতন্যও আনন্দস্নাত হতেন তাঁর সুমধুর পদমাধুর্যে। এর ফলে বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে তাঁর পদ আরও পরিচিত ও সমাদৃত হল। তিনিও পরিচিত হলেন বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে। বাঙালীর কন্ঠবাহিত হয়ে তাঁর মৈথিলী পদগুলি বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারল না। স্থানীয় ভাষা ও শব্দ মিশ্রিত হয়ে তা এক নবীন রূপ পেল—যে মিশ্রভাষার নাম ব্রজবুলি। ফলত বিদ্যাপতি হয়ে গেলেন ব্রজবুলি ভাষার বাঙালী কবি। চণ্ডীদাসের পদ যদি হয় বৈষ্ণবপদগঙ্গার অলকানন্দা, তবে বিদ্যাপতির পদ মন্দাকিনী। উভয়ের মিলিত কাব্যধারায় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ অবগাহন। কবিখ্যাতিতে অক্ষম কবিরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন নিজেদের পদ তাঁদের ভণিতায় প্রকাশে। এমনকি, অনেক বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তা (বিশেষ গোবিন্দ দাস) ব্রজবুলির ছন্দ ও সুরতরঙ্গে প্রাণিত হয়ে তাতেই পদরচনায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। ফলত মিথিলার কবি হয়েও বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন নানা ভাবে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এবং বাঙালী কর্তৃক তাঁর পদগুলিকে বাঙালীর সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করায় বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাপতি হলেন অপরিহার্য।

বিদ্যাপতি সংস্কৃত কাব্য ও অলংকারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। গীতগোবিন্দের ললিতকলামাধুরীর তিনি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর পদাবলীতে এই দুই প্রভাব স্বতোৎসারিত। অলংকার শাস্ত্রানুসারে তিনি রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, প্রথম মিলন, বাসকসজ্জা, অভিসার, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি লীলা পর্যায়ে তাঁর পদগুলিকে সজ্জিত করেছেন। ফলে তাতে আছে ঘটনার একটি ধারাবাহিকতা। অন্যপক্ষে ভাষা, পদবন্ধ ও চিত্রকল্প বয়নে তিনি ছিলেন অপরূপ রূপকার। মণ্ডনকলায় জয়দেবের সঙ্গেই তিনি তুলনীয়। এই 'কবি সার্বভৌমে'র কাব্যকৃতির দুটি স্তর লক্ষ্য করেছেন সমালোচক। একটিতে মনোভঙ্গির প্রাধান্য, অন্যটিতে প্রাণভঙ্গির। ছন্দ ব্যবহারে তিনি ছিলেন নিপুণ শিল্পী, অলংকার রচনায় দক্ষ কারিগর। সব মিলিয়ে বিদ্যাপতির পদ সাহিত্যের অনন্য সম্পদ।

তবু বিদ্যাপতি পদ নিখুঁত নয়। তাঁর রচনায় বিলাসের বীণা যত বেজেছে, ছন্দের নিক্কণ যত ধ্বনিত, বেদনার বাঁশি তত বাজেনি। তাতে যত আছে ঐশ্বর্য, তত নাই গভীরতা। বাস্তবতা ও রমণীয়তার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগে উপেক্ষিত হয়েছে আধ্যাত্মিকতা। দেহাতীত নয়, রূপজ প্রেমেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ।

অভিসার, বিরহ ভাবসম্মিলন ও প্রার্থনার পদরচনায় বিদ্যাপতি অনন্য। বিরহাতুরা রাধা যখন বলেন ঃ

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥

অথবা কবি যখন প্রার্থনা করেন

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

হয়ত খুঁজে পাওয়া যায় না কোনো সাধক বৈষ্ণব কবিকে, কিন্তু পেতে অসুবিধা হয় না অনুভব-গাঢ় একটি শ্রেষ্ঠ কবি-আত্মাকে। প্রেমের রহস্য, প্রেমিকার মনস্তত্ত্ব, ভাষার দীপ্তি, ছন্দ-অলংকারের সৌকর্য প্রকাশে বিদ্যাপতি সেযুগেও ছিলেন অতুলনীয়।

পরের যুগে যে বাঙালী কবির উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল তাঁর নাম গোবিন্দদাস। তিনি ষোড়শ শতকে জন্মগ্রহণ করেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঃ

কবিখ্যাতিতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সঙ্গেই তুলনীয়, যদিও উভয়ের কাব্যরীতিতে কোনো মিল নাই। বিদ্যাপতির কবিতায় নাগরিক ঐশ্বর্য—ছন্দ, অলংকার ভাষা-চাতুর্যের সমাবেশ এবং তা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম মেনে। চণ্ডীদাসের কবিতায় কাব্যকথা নির্মাণে কোনো সচেতন প্রয়াস নাই। প্রাচীন কাব্য-রীতির পর্যায় পরম্পরাও তাই সেখানে নাই। হৃদয়োৎসারিত মর্মবেদনা সেখানে ভাষা পেয়েছে যেন অনায়াস চেষ্টায়, কেবল একান্ত আন্তরিকতায়। গভীরতা তার আশ্রয়, ভাষার সহজ সরলতাই মার্জিত ঐশ্বর্য। বিদ্যাপতির কবিতার মতো পাণ্ডিত্য সেখানে প্রকাশিত নয়, ভাব-গভীরতার মধ্যে অদৃশ্য। প্রেমে ও মিলনে বিদ্যাপতির কবিতায় সুখের উল্লাস, চণ্ডীদাসের কবিতায় কেবল-ই আর্তি, বিষাদ ও বেদনা। পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতি অনন্য। যদি আলংকারিক অনুশাসন কাব্যবিচারের মাপকাঠি হয় বিদ্যাপতি অদ্বিতীয় কবি। কিন্তু হৃদয়ের মিস্টিক ব্যঞ্জনার বিচারে চণ্ডীদাস দ্বিতীয়-রহিত। তাঁর কবিতায় প্রেম হয়েছে সাধনা

এবং দুঃখ তার অনুষঙ্গ। শিব-কাঙ্ক্ষিতা উমা অপর্ণার মতোই তাঁর রাধার প্রেম-তপস্যা। কবি নিজেই বলেছেন 'রাধার বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমতি যোগিনী পারা।' দ্বিধাহীন আত্মনিবেদনেই চণ্ডীদাসের রাধার তপস্যার পরিসমাপ্তি।

ভাববিহ্বল রাধা কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনেই পাগলিনী

সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

কৃষ্ণের দেহ-বর্ণ স্মরণেও সে উদাসিনী। তার অবস্থা কবির ভাষায়

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।

এই ধ্যানমগ্না যোগিনী কৃষ্ণ-মিলনে প্রার্থনা করেছে

জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি॥

সেটাই চণ্ডীদাসের রাধার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ প্রেম তার কাছে কি একটি বাক্যের স্বল্প পরিসরেই সে তা ব্যক্ত করেছে 'বঁধু সে আমার প্রাণ'। প্রেমের অতলান্ত চিন্তায় সে বুঝেছে কৃষ্ণপ্রেম ব্যাখ্যার অতীত। তাই ঘোষণা করেছে

রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥

চণ্ডীদাসের রাধা সরলা গ্রাম্য বালিকা, চণ্ডীদাসের কাব্যেও গ্রাম্য সরলতা। চরিত্রের উপযোগী ভাষা, উভয়ে উভয়ের সহযোগী। এই দ্বৈতমিলনই চণ্ডীদাসের কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য। কবিও মানতেন নিখাদ প্রেম উচ্ছ্বাসের বৈরী। তাই লিখেছেন

'শুন বিনোদিনী পিরীতি না কহে কথা'।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই চৈতন্যযুগের পূর্ববর্তীকালের কবি। সুতরাং চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাব তাঁদের কবিতায় নাই। তাঁরা ভক্ত নন, কবি ; সাধক যদি হন, তবে সে কাব্যসরস্বতীর। রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। তাঁদের রাধা শুধু প্রেমের বশেই কৃষ্ণ-অনুরাগিণী। উভয়ের আবির্ভাবে কালগত সদৃশতা থাকলেও উভয়ের মনোধর্মে ছিল প্রচুর বৈপরীত্য।

বিদ্যাপতি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং মিথিলার রাজসভাকবি। তার চিহ্ন আছে তাঁর চিত্রিত রাধাচরিত্রে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নায়িকার প্রেমের নানা পর্যায়ক্রম আছে। পূর্বরাগ, অভিসার, মান ইত্যাদি সেই পর্যায়গুলি যথারীতি

অনুসৃত বিদ্যাপতির পদে। তাছাড়া, অলংকার ও ছন্দ কুশলতায়ও তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র এবং গীতগোবিন্দের অনুগামী। তাঁর বৈদগ্ধ্যের ছাপ তাঁর চিত্রিত রাধাচরিত্রে। সে রূপসচেতন, এমনকি প্রেমের প্রকৃতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞ। সখিদের সে বলেছে

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিঅ
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

অন্যপক্ষে, চণ্ডীদাসের কবিতায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় নাই, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিদগ্ধ ছিলেন এমন কোন প্রমাণও নাই। তাঁর কবিতার ভাষায় আশ্চর্য সরলতা, রাধাচরিত্রেও সারল্য। সে প্রেম অনুভব করে, কিন্তু তার ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অপারগ—'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা'—এই ভঙ্গিতেই তার প্রেমানুভূতির প্রকাশ। আপন অনুভূতি সম্পর্কে তার বক্তব্য

বদন থাকিতে না পারে বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম।

'দেহসৌন্দর্যের লীলাচাঞ্চল্য' প্রকাশে বিদ্যাপতির দৃষ্টি দেহেই নিবদ্ধ, চণ্ডীদাসের দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত ঃ

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

কৃষ্ণের এ-উক্তিতে নাই কোন বাস্তব বর্ণনা, এ-ভাষার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা শুধুই অনুভববেদ্য। বিদ্যাপতিতে আছে দেহের তপস্যা, চণ্ডীদাসে বেদনার সাধনা। সে বেদনায় চণ্ডীদাস যদি একটু কটাক্ষ মেশান, তবে তা হয় যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেও ঈর্ষণীয় সাহিত্য। পুনর্মিলনে রাধার প্রশ্ন—

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥
আমি এতেক সহিনু অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥

এমনি একটি কাব্যিক নিদর্শন।

প্রার্থনার পদেই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের একটু কাছের মানুষ। 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম সুত-মিত-রমণী সমাজে' বীতস্পৃহ হয়ে যখন তিনি 'দেহি তুলসী তিল' দেহ-নিবেদন করেছেন ভগবৎ-কৃপার অপেক্ষায়, তখন তিনি পাণ্ডিত্যের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে না পারলেও চণ্ডীদাসের মতোই ভক্তি-নিবেদিত-প্রাণ কবি হয়ে উঠেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদাপতি নবীন এবং মধুর। একের উপকরণ হৃদয়ের প্রগাঢ় উপলব্ধি, অন্যের উপাদান মহৎ সৃষ্টির উত্তরাধিকার। এখানেই দুই শ্রেষ্ঠ কবির চেতনা ও প্রকাশ রীতির বিশেষত্ব।. এভাবেই রবীন্দ্র-উক্তির যথার্থতা অনুধাবন করা যায়।

চণ্ডীদাস :

পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালীন অথবা সামান্য পরবর্তীকালের কবি। চৈতন্য তাঁর গান আস্বাদনে বিহ্বল হয়ে যেতেন, সুতরাং তিনি অন্তত চৈতন্যপরবর্তীকালে জন্মাননি। তাঁর কবিখ্যাতিতে মুগ্ধ অনেক কবিই এই ভণিতায় পদরচনা করেন। জানার উপায় নাই, আমাদের আলোচ্য চণ্ডীদাসের পদ ঠিক কতগুলি এবং ঠিক কতজন চণ্ডীদাস বাংলার কাব্যাকাশ আলোকিত করেছেন। তবে দুঃখের পদাবলীকার চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যমাধুর্যে শুধু শ্রীচৈতন্য বা বৈষ্ণবজন-সমাজকেই নয়, আপামর বাঙালীর হৃদয় আলোড়িত করেছেন বিগত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে। অন্য কোনো কবি কেবল ভণিতাটুকু ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

সরলতা ও গভীরতা চণ্ডীদাসের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। সরলতা যেমন কবির ভাষায়, তেমনি তাঁর চিত্রিত রাধা চরিত্রেও। বলাবহুল্য, চণ্ডীদাসের পদরচনার বিষয় প্রেম। রাধা নানক একটি গ্রাম্য বালিকার সরল ও অকপট অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহ কি রূপান্তর ঘটাল, তারই অসাধারণ প্রকাশ তাঁর রচনায়। রাধা চরিত্র বর্ণনায় চণ্ডীদাস কখনো তাকে বিদগ্ধা করে তোলেন নি। তার বৈদগ্ধ্য যা কিছু জন্মেছে তা শুধু কৃষ্ণপ্রেমের অভিজ্ঞতায় ও প্রেমের রহস্য-উপলব্ধিতে। বিদ্যাপতির মতো রসশাস্ত্র অনুযায়ী প্রেমিকার প্রেম-উপলব্ধির বিশ্লেষণ চণ্ডীদাস চিত্রিত করেন নি, তবু তাঁর রচনায় রাধার প্রেম-অভিজ্ঞতার নানা পর্যায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম প্রেম-অনুভবে সে সলজ্জা, যথেষ্ট চঞ্চলাও :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।

কৃষ্ণের অঙ্গ-সাদৃশ্যে প্রকৃতির মধ্যেও সে খুঁজে পায় প্রেমের উপাদান :

মন উচাটন বিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

সখীদের সঙ্গে যমুনায় জল আনতে গেছে সে। কিন্তু সেখানেও কৃষ্ণপ্রেম প্রকৃতিতে অন্বিত হয়ে ধরা দেয় তার কাছে

সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥

শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বত্রই তখন প্রেম তার হৃদয় জুড়ে অবস্থিত। কৃষ্ণপ্রেম ও নিজের অন্তরকে বিশ্লেষণ করতে না পারলেও আপন উপলব্ধিকে সে সরলবিশ্বাসে প্রকাশ করতে পারে

বঁধু সে আমার প্রাণ।

এই আপাতসাধারণ উক্তির মধ্য দিয়েই তার প্রেমের গভীরতা অনন্যসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

রাধার বিশ্বস্ত প্রেম প্রতিহত হয়েছে কৃষ্ণের প্রদত্ত বিরহদশায়। যাকে সে এত ভালবাসে তার কাছে প্রেমের যোগ্য প্রতিদান লাভ সম্ভব হয়নি রাধার পক্ষে। অথচ কৃষ্ণ-অনুরাগ ভিন্ন অন্য চিন্তাও তো নাই রাধার। ফলে তার অন্তরের জ্বালা প্রেমিকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে তার চৈতন্যোদয় ঘটাক এই কামনায় রাধা উচ্চারণ করেছে

আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।

সম্পূর্ণ নিরাভরণ তার ভাষা। কিন্তু প্রেমিককে সচেতন করে তোলার শ্রেষ্ঠ উপায়টুকু ব্যঞ্জিত হয়েছে এই আপাতসরল কামনার মধ্যেও।

অবশেষে কামনায় সিদ্ধি। কৃষ্ণের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছে রাধার। কিন্তু তখন তো বিরহানলে দগ্ধ-অন্তর রাধা মিলনের মাধুর্যের সঙ্গে বিরহের ব্যাকুলতার সঙ্গেও পরিচিতা। প্রেমোন্মেষের প্রথম অভিজ্ঞতার সরলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছুটা তিক্ত অভিজ্ঞতাও। সরলা হলেও রাধা তার সেই অভিজ্ঞতাকেও তো ভুলতে পারে না। সহজ অথচ মর্মস্পর্শী ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সে প্রকাশ করে আপন অনুভব:

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥

রাধা জানিয়েছে সে 'অবলা' বলেই এত কষ্ট সহ্য করতে পারল, পাষাণ হলে কিন্তু এ দুঃখভার সহনীয় ছিল না—'ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে'।

তবু কৃষ্ণভিন্ন অন্যতর চিন্তা তো রাধার অন্তরে নাই। কৃষ্ণ তাকে যত দুঃখ দিক, কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়ে সে যত কষ্ট পাক, তার কৃষ্ণ-অনুরাগ তো কখনো নিবৃত্ত

হবার নয়। সুতরাং আত্মনিবেদনের বেলায় সে শুধু এ জন্মেই কৃষ্ণকে দয়িতরূপে কামনা করেনি, জন্মজন্মান্তরেও তাকে পাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছে

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হয়ো তুমি ॥

এই চিরকালীন সমর্পিতচিত্ততাই চণ্ডীদাসের রাধা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। চণ্ডীদাসের ভাষা কোন সচেতন প্রয়াসের ফল নয়, আত্মগত উপলব্ধির বাঙময় রূপ। সে ভাষার দক্ষতায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্যের, দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন-তপশ্চর্যার প্রয়োজন নাই, অপরিহার্য কেবল অলোকসামান্য হৃদয়ানুভূতির। চণ্ডীদাস সেই সম্পদেই বলীয়ান। তাই তাঁর রচনা নিসর্গের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মতো আমাদের মনকে আবিষ্ট করে; জানায় এক কবির কথা হৃদয়ের অনাবিল ভাবপ্রকাশে যিনি সরল অথচ ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষাশ্রয়ী।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার :

বৈষ্ণব পদসাহিত্যের দুটি ধারা। একটি বিদ্যাপতি-প্রবর্তিত ভাষা-ভাবানুষঙ্গের বর্ণাঢ্যতায় উচ্ছল ধারা; গোবিন্দদাসে তার অনুক্রমণ। অন্য ধারা সহজ ভাষায় ভাবগভীরতার পরিচয়। সে-অবদান চণ্ডীদাসের, জ্ঞানদাস প্রমুখের পদে তারই অনুশীলন। 'সহজ কথা যায় না কহা সহজে', রবীন্দ্রনাথের এ উক্তকে অযথার্থ প্রমাণ করেছিলেন চণ্ডীদাস, আধ্যাত্মিকতাকেও সহজ ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

চণ্ডীদাস সাধক, জ্ঞানদাস সচেতন শিল্পী। পদরচনায় তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ের পথই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মানসিকতার সঙ্গে চণ্ডীদাসেরই ছিল আশ্চর্য সংযোগ। তাঁর শ্রেষ্ঠ পদগুলি চণ্ডীদাসকেই স্মরণ করায়। সারল্য ও আন্তরিকতায় যখন তাঁর কাব্যবীণা বাঁধা, তখনই তিনি অকৃত্রিম ও যথার্থ শিল্পী। মনোভঙ্গিতেই এই দুই কবি এক। চণ্ডীদাসের রাধার উক্তি 'বঁধু সে আমার প্রাণ'। জ্ঞানদাসের রাধা বলেছে

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
এবং তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।

ভাবনা ও ভাষায়, কবি-চেতনায় ও প্রকাশে এই একাত্মতার কারণে একই পদে উভয়ের ভণিতা দেখা যায়। রসজ্ঞ বৈষ্ণবের পক্ষেও সম্ভব হয় না প্রকৃত পদকর্তার নাম নির্ধারণ করা, যদিও সর্বজনস্বীকৃত মত এই যে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস অপেক্ষা বড় কবি ছিলেন।

এই সকল কারণে চণ্ডীদাসের উত্তরসূরী অথবা ভাবশিষ্যরূপে জ্ঞানদাসকে গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃত্তিবাস ওঝা ও তাঁর রচিত রামায়ণ

কবি পরিচয় ঃ

কবি কৃত্তিবাস ওঝা ছিলেন বাংলা রামায়ণের আদি কবি। তিনি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের আদি কবি বাল্মীকি রচিত সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত ও চব্বিশ হাজার শ্লোকে গ্রথিত সংস্কৃত রামায়ণের বাংলাভাষায় ভাবানুবাদ করেন।

কৃত্তিবাসের কাব্যেই তাঁর একটি 'আত্ম-পরিচয়' আছে। তার সাহায্যে কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছু অপূর্ণ তথ্য জানা যায়। এই 'আত্মপরিচয়' অনুসারে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ নিবাসী ছিলেন। সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে তিনি সে দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে এসে বসবাস করেন। কৃত্তিবাস ছিলেন নরসিংহ ওঝা থেকে পঞ্চম পুরুষ। তাঁর পিতার নাম বনমালী, মাতার নাম মালিনী। এঁরা ছিলেন মুখোপাধ্যায় উপাধিক। কৃত্তিবাসেরা ছ'ভাই এক বোন। নিজের জন্মকাল সম্পর্কে কবি বলেছেন

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

অর্থাৎ মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে তাঁর জন্ম হয়। জ্যোতিষ ও কুলজী শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করে পণ্ডিতেরা এই ইঙ্গিত থেকে শুধু এটুকু সিদ্ধান্তে আসতে সমর্থ হয়েছেন যে কৃত্তিবাস চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স এগার পার হলে কবি বিদ্যার্জনের জন্য পদ্মা পার হয়ে উত্তরে গেলেন এবং গুরুগৃহে বেশ কিছুদিন থেকে পাণ্ডিত্য অর্জন করে উপস্থিত হলেন গৌড়েশ্বরের সভায়। কবি এই সভার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিলেও রাজার নামোল্লেখ করেননি। তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ রাজা কবিকে অর্থ দান করতে চাইলে নির্লোভ কবি পরিবর্তে চাইলেন কবিখ্যাতি ঃ

আর কিছু নাঞি চাই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥

যশ নিয়েই তিনি ফিরে এলেন নিজগ্রাম ফুলিয়ায় এবং সেখানে বসে রচনা করলেন তাঁর অনন্য কাব্য রামায়ণ পাঁচালী।

কাব্যকথা ঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। আদি, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা পরপর এই কাণ্ড সাতটি সজ্জিত। এটি বাল্মীকি রামায়ণের

আক্ষরিক অনুবাদ নয়। মূল রামায়ণের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, বিশ্বামিত্রের কথা ইত্যাদিপ্রসঙ্গ তিনি বর্জন করেছেন। আবার দস্যু রত্নাকরের মহাতাপস বাল্মীকিতে রূপান্তর, রাবণহত্যার জন্য রামের অকালে দেবীপূজা—'অকালবোধন', তরণীসেন প্রসঙ্গ, হনুমানের রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ সংযোজন করেছেন। আসলে, বাল্মীকির রামায়ণের মূল কাঠামোটিকে অক্ষুণ্ন রেখে তিনি স্বাধীনভাবে একটি রামকথা রচনা করেছেন। আবার কৃত্তিবাসের সৃষ্টির যথাযথ রূপও আমাদের হাতে আসে নি। নানা কবি ও পালাগায়কের নানা মার্জনার চিহ্ন নিয়ে রামায়ণ পাঁচালী আমাদের হস্তগত। সুতরাং জানার উপায় নাই কৃত্তিবাসের রচনার আসল রূপ কি ছিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছিল মধ্যযুগে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। মধ্যযুগীয় জাতীয় সাহিত্যের সম্মানও কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রাপ্য। কারণ, সমগ্র জাতি এ কাব্যকে সাদরে গ্রহণ করেছিল. কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্তমান রূপে ব্যক্তিবিশেষের হাতের ছাপ না থেকে আছে বহুকবির বাণীর ছাপ. কবির চিত্রিত চরিত্রগুলি অবিকল বাঙালী চরিত্র এবং এ কাব্যে আছে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর। কাব্যের বিষয় ও কবির কৃতিত্বে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অসামান্য জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল।

রামায়ণ কাহিনীতে আছে ধর্মের কথা ও একটি সর্বজনীনতার ভাব। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত অথচ এই ধর্মের গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে রচিত। সংস্কৃত জ্ঞানহীন আপামর গৌড়জন ধর্মসুধা পানে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু তার প্রয়োজনানুরূপ উপায় ছিল না। জনচিত্তের সে আশা পূর্ণ হয়েছিল কৃত্তিবাসের ধর্মগ্রন্থ তথা ভক্তিগ্রন্থ রামায়ণ রচনায়। রামায়ণের অসাম্প্রদায়িক আখ্যান মুগ্ধ করেছিল ধর্মপ্রাণ হিন্দু প্রজার মতো মুসলমান শাসক গোষ্ঠীকেও। তাঁরা সর্বমানবিক আবেদনের জন্য রামায়ণ অনুবাদে উৎসাহও দিতেন। রাজার কাছে যা-ছিল অবসর বিনোদনের উপায়, প্রজার কাছে যা ধর্মের অনুশাসন তথা হৃদয়ের বাণী, তার জনপ্রিয়তায় বাধা ছিল একমাত্র ভাষা—কৃত্তিবাস সে বাধা অপসারণ করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্বে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালীমাত্রেই পান করতে পেরেছিল রামায়ণের কাব্যসুধা।

কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, সে-কাহিনীকে অবলম্বন করে এবং অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে কাহিনী চয়ন করে, এমন কি, প্রচলিত কাহিনীকে স্থান দিয়ে এবং নিজে কাহিনী বানিয়ে তাঁর কাব্যকে করেছেন একটি সার্থক বাঙালী রামায়ণ। তাঁর চিত্রিত রাম, সীতা ইত্যাদি চরিত্রে নাই মূল রামায়ণের চরিত্রের দৃঢ়তা—সেখানে রাম সর্বত্র পৌরুষদীপ্ত নন, সীতা নন অন্যায়ের প্রতিবাদে ফণিনী—রোদনপ্রবণ, নিরুপায় রাম এবং পতিব্রতা সীতা বাঙালীয়ানারই আদর্শ রূপায়ণ।

কৈকেয়ীও নন স্বার্থমগ্না নারী মাত্র তিনিও বাঙালী মা-রূপেও চিত্রিত ঃ

যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষ পান করে॥

দশরথ এখানে দুর্বলচিত্ত বাঙালী বৃদ্ধ। মুনি-ঋষিরা ভোজনপ্রিয় বাঙালী ব্রাহ্মণ। মূল রামায়ণের ক্ষাত্রতেজ ব্রাহ্মণ্য বিশিষ্টতা কৃত্তিবাসের রামায়ণে দুর্লভ। অলস, ভোগপরায়ণ, দোষেগুণে মিশ্রিত বাঙালী চরিত্রই এঁকেছেন কৃত্তিবাস এবং বাঙালী স্বভাবের এমন যথার্থ প্রতিচ্ছবি মধ্যযুগের আর কোন কাব্যে নাই।

ভক্তিরস ও গার্হস্থ্য চিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুখ্য দুই সম্পদ। রামনাম কীর্তনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মহাকবির উক্তি ঃ

রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা॥

তরণী সেন তো আমরণ রামের প্রতি ভক্তিগদগদ ; এমনকি তার কাটা মুণ্ডও 'রাম' নাম উচ্চারণ করে। রাবণ পরস্ত্রীলোলুপ। কিন্তু তার অন্তরেও প্রবাহিত রামভক্তি। রামের সঙ্গে যুদ্ধকালে সে করে রামের স্তুতি। বিষণ্ণ রামের খেদোক্তি না করে উপায় থাকে না 'কেমনে এ ভক্তে করিব সংহার।'

পিতা ও পতির প্রতি ভক্তি, পুত্রবাৎসল্য, ভ্রাতৃ ও পত্নীপ্রেম—বাঙালী জীবনের আদর্শগুলি, কৃত্তিবাসের রামায়ণে নিপুণভাবে চিত্রিত। বাঙালী পরিবারের জীবনযাত্রাপ্রণালী কৌশল্যামাতার সহনশীলতায়, সীতার পতিগতপ্রাণতায়, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমে, সুগ্রীবের বন্ধুত্বে, হনুমানের দাস্যে, অপূর্ব দক্ষতায় অঙ্কিত। ঋষি ভরদ্বাজ বানর বাহিনীকে যে খাদ্য পরিবেশন করেছেন সেই মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদি বাঙালীরই একান্ত প্রিয় খাদ্যসামগ্রী। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালী পেয়েছে তার আরাধ্য আদর্শ চরিত্র এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুশাসন—সাদরে সে বরণ করেছে এ-কাব্যকে। কৃত্তিবাসের অতুলনীয় ভাবসম্পদে, চরিত্রনির্মাণ-কুশলতায়, ছন্দ-অলংকার প্রয়োগে দক্ষতায় এবং সর্বোপরি অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ বাঙালী ধর্মচর্চায় ও অবসর বিনোদনে সর্বাধিক আকৃষ্ট হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ দ্বারা। কাব্যসৌন্দর্যও কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার একটি মুখ্য কারণ।

মালাধর বসু ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

কবিপরিচয় ঃ

সংস্কৃত ভাগবত পুরাণের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ভাগবতের প্রথম অনুবাদের কৃতিত্বও তাঁর-ই। অনুবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন

ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে॥

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় (কোনো কোনো পুঁথিতে গোবিন্দবিজয় অথবা গোবিন্দ মঙ্গল) বিখ্যাত গ্রন্থ হলেও বৈষ্ণব সমাজের বাইরে বিশেষ পরিচিত ছিল না। শ্রীচৈতন্য অবশ্য এ-কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন

তথি এক বাক্য আছে অতি প্রেমময় ॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ।
এই পদ্যে বিকায়িনু তাঁর বংশের হাথ ॥

মালাধর বসু ছিলেন বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রাম নিবাসী। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন সৎ কায়স্থ আনেন মালাধরের পূর্বপুরুষ দশরথ নাকি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। গৌড়েশ্বর (সম্ভবত রুকনুদ্দীন বরবক শাহ) ছিলেন তাঁর গণমুগ্ধ এবং তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেন। ('গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান') শোনা যায়, রাজানুগ্রহে তিনি উচ্চ রাজকর্মচারীর পদেও বৃত ছিলেন। আপন জন্মকাল সম্বন্ধে নীরব থাকলেও কবি তাঁর কাব্যরচনা কাল সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন ঃ

তেরশ' পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন ।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥

১৩৯৫ থেকে ১৪০২ শক অর্থাৎ ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ ছিল কাব্যরচনা-কাল। সোজাসুজি এভাবে তারিখের উল্লেখ বাংলায় প্রথম মালাধরের কাব্যেই পাওয়া গেল।

মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ বসু। রামানন্দ ছিলেন চৈতন্যের অন্যতম ভক্ত ও পার্ষদ। চৈতন্যের আবির্ভাবের (১৪৮৬ খ্রীঃ) কিছু আগে মালাধর তাঁর কাব্য শেষ করেন।

কাব্যকথা ঃ

ভাগবতে আছে দ্বাদশ স্কন্ধ ও আঠার হাজার শ্লোক। মালাধর শুধু দশম ও একাদশ দুটি মাত্র স্কন্ধের (এবং দ্বাদশ স্কন্ধের আংশিক) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। অর্থাৎ তাঁর বর্ণিত বিষয় কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত। কবি ভাগবতের তত্ত্বাংশকে বর্জন করে কাহিনীর উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। কাহিনীকে 'লৌকিক' করার জন্যই বোধহয় এই প্রচেষ্টা। প্রয়োজনবোধে তিনি হরিবংশ, বিষ্ণু-পুরাণ থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সেদিক থেকে তিনি প্রশংসারই যোগ্য। কিন্তু সরল ত্রিপদী ও পয়ারে ঘটনার বিবরণ ছাড়া এই কাব্যে অন্য কোনো কাব্যগুণ বিশেষ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কবির আবেগ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পেলেও তার

স্থান কাব্যটিতে সংকীর্ণ। কাব্যটিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যগুণ অপেক্ষা রাজসিক ভাবের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা কাব্যটির অন্যতম সম্পদ।

মালাধর ভাগবতের যথাযথ অনুবাদ করেননি, তত্ত্বাংশ বর্জন করেছেন। তবু এই বর্জিত অংশকে বাদ দিলে তাঁর অনুবাদ ছিল মোটামুটি মূলানুগ। এ-বিষয়ে কৃত্তিবাসের মত স্বাধীনতা তিনি গ্রহণ করেন নি। ফলত তাঁর কাব্যে নাই রামায়ণের মতো গার্হস্থ্য চিত্র। মাতা যশোদা ক্রীড়ারত পুত্র কৃষ্ণকে 'ভাত খ্যায়্যা পুনরপি খেলহ আসিয়া' এই উপদেশ দিয়ে বাঙালী মাতৃমূর্তির যে পরিচয় দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তার স্থান সংক্ষিপ্ত। তবু চৈতন্যের আবির্ভাব ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের আগেই মালাধর ভাগবত কাহিনীকে জনসাধারণের গোচরে এনে ভাবী মহীরূহের বীজ উপ্ত করেছিলেন, কবির এ কৃতিত্ব বাঙালী সমাজে ও বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

চতুর্থ অধ্যায়

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গলসূচক গান, ব্রতকথা ও লোককাহিনী যখন কাব্যাকারে লিখিত হল তখন তার সাধারণ পরিচয় হল মঙ্গলকাব্য। ঠিক কবে থেকে এই লিখিত রূপের আবির্ভাব ঘটেছিল তা জানা যায় না। পঞ্চদশ শতক থেকে তার সাক্ষাৎ মেলে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে, আরও দু-একশ বছর আগে থেকেই এর প্রস্তুতিপর্ব অথবা কৈশোর কাল দেখা দিয়েছিল। বিশেষ, তুর্কী আক্রমণের ফলশ্রুতিতেই অপৌরাণিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মিলন সম্ভব হয়েছিল এবং মঙ্গলকাব্য এই নবসৃষ্ট দেবদেবীরই বন্দনাগান। ফলত, ত্রয়োদশ শতকেই তার সূচনা হওয়া সম্ভব। লক্ষণীয়, মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের কাঠামো সুদূর অতীত থেকেই গ্রামীণ সমাজে মৌখিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। তারই নব রূপান্তর, সম্প্রসারণ ও লিখিতরূপ পাওয়া গেল মঙ্গলকাব্যকাহিনীতে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের প্রাথমিক রূপ অশিক্ষিত জনের ভয়-ভক্তি-সংস্কার-বিশ্বাসে সৃষ্ট। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ও রোগভীতি এই সৃষ্টির মূলে কাজ করেছিল। বাংলায় আর্য-আগমনের আগেই বাঙালীরা এই দেবদেবীর রূপের কল্পনা করে। ফলত, এই দেবদেবীগুলি সভ্য সমাজের মার্জিত রুচির দেবতা নন; ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির মানুষী দুর্বলতা দিয়ে গড়া তাঁদের রুচি। অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলেই তাঁদের মাহাত্ম্যকথায় ভক্তের আসক্তি। মঙ্গল অর্থ কল্যাণ। মঙ্গলসাধন করেন বলে এঁরা মঙ্গল দেবদেবী এবং এঁদের নিয়ে রচিত আখ্যান মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য নামের আরও কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ঐতিহাসিক। এই কাব্য গীত হত মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত; মঙ্গল সুরে গীত হত এই গান বা আখ্যান; মঙ্গল নামক অসুর নিহত হয়েছিল দেবীকর্তৃক এবং এই জাতীয় কাব্যকাহিনী গুলিতে দেবদেবীর বিজয় অর্থাৎ মাহাত্ম্য বর্ণিত। এই চতুর্বিধ কারণেও নাকি মঙ্গলকাব্য নামে আখ্যাত হয়েছে কাব্যগুলি। মূলত মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত।

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ

তুর্কী আমলের 'তামস যুগের' অবসানে বাংলা সাহিত্য যখন আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল তার অন্যতম মুখ্য ধারা হয়ে উঠল মঙ্গলকাব্য-ধারা। মঙ্গলকাব্য নামটি প্রাচীন নয়, মঙ্গল গানের কথা যদিও অশোকের সময়েও অজানা

ছিল না। গৃহ ও গোষ্ঠী-কল্যাণমূলক গীতিই মঙ্গল গান আর ব্রতকথা ও লোকগাথার ক্ষুদ্র পরিসর ছাড়িয়ে যখন তা ছন্দ অলংকারে সমৃদ্ধ বিশাল কাব্যে পরিণত, তখন তার নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল কাব্যকাহিনীর প্রভাব বাঙালী সমাজে ফল্গুস্রোতের মতো অন্তঃসলিলা ছিল পঞ্চদশ শতকের আগে উনিশ শতকে এদেশে ইংরেজি সভ্যতার প্রসারের পরে তার পরিণাম হয়েছে ক্ষীয়মাণ। মধ্যবর্তী কালে (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকে) মঙ্গলকাব্য রচনা ও পাঠের বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয় বাঙালী সমাজে।

কোমবদ্ধ আদিম জীবনধারায় বাঙালী কৃষি, গৃহশিল্প ও শিক্ষা—এই তিনের উপরই নির্ভরশীল ছিল। ভয়, ভক্তি, বিস্ময়ে সে দেবতার কল্পনা করেছে এবং তারই মাহাত্ম্য বর্ণনায় রচনা করেছে ব্রতকথা। গার্হস্থ্য জীবনে জন্ম বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও গৃহদেবতার প্রাত্যহিক পূজা এবং সামাজিক জীবনে ফসল বোনা, ফসল তোলা, ঋতুউৎসব, গ্রামদেবতার বাৎসরিক পূজা ইত্যাদিকে উপলক্ষ করে এইসব গান রচিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে ও পরবর্তীকালে আর্যসংস্কৃতি ও ধর্মের বঙ্গদেশে প্রসারের ফলে এবং সমাজে বৈদিক ক্রিয়ানুরক্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে লোকায়ত এই চিরন্তন প্রথা আর্যেতর অনভিজাত অশিক্ষিত জনসাধারণ, বিশেষ মহিলাকুলের আশ্রয়ে লালিত হয়েছিল। তুর্কী আমলে উচ্চবর্ণের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও এই ধারা ছিল বহমান। অবশেষে পঞ্চদশ শতকে ও পরবর্তী তিন শতকে উচ্চনীচ ভেদাভেদে সকল শ্রেণীর বাঙালীর সাহিত্যচেতনা ব্রতকথা-ছড়া-পাঁচালীর চিরায়ত কাঠামোকে শিল্প সুষমামণ্ডিত করে রচনা করেছে মঙ্গল কাব্য।

'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ গৃহকল্যাণ। মঙ্গলদেবদেবীরা মুখ্যত বাস্তু ও গ্রাম-দেবতা। মহামারী, সর্প, ব্যাঘ্র, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি জাগতিক অকল্যাণের হাত থেকে তাঁরা ভক্তকে রক্ষা করেন। বসন্ত রোগ নিরাময়ের দেবী শীতলা, চর্মরোগের ধর্মঠাকুর। সর্প ও ব্যাঘ্রভয় দূর হয় যথাক্রমে মনসা ও দক্ষিণ রায়ের পূজায়। এইভাবে এক একটি বিঘ্ননাশের জন্য কল্পিত হয়েছেন এক একটি দেবতা অথবা দেবী। বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে ভয়-ভক্তির মিশ্রণে এ সকল দেবদেবী আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন জৈন, বৌদ্ধ ও আর্য ধর্মের প্রভাবের পাশাপাশি। তুর্কী আক্রমণের ফলস্বরূপ আর্যধর্ম যখন বিধ্বস্ত, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নিরক্ষর ও অন্ত্যজ শ্রেণী আত্মরক্ষায় ও সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার লোভে যখন দলে দলে ইসলাম ধর্মগ্রহণে তৎপর, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজ দিশাহারা ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে কামনা করেছে এমন দেবদেবীর আবির্ভাব, যিনি এই সার্বিক দুরবস্থার হাত থেকে বাঙালীকে উদ্ধার করতে পারেন। এ বিষয়ে মঙ্গলদেবদেবীরা আদর্শস্থানীয়। কারণ, ভক্তকে তাঁরা শুধু রক্ষা করেন না, ভক্তের জন্য উচিত-অনুচিত সর্বকর্মেই তাঁরা দড়। সুতরাং নিম্নকোটির দেবদেবী তুর্কী আক্রমণের ফলশ্রুতিতে উচ্চকোটিরও উপাস্য

হয়ে উঠলেন—সমগ্র হিন্দুসমাজ মুক্তি ও শান্তির আশায় লোকায়ত দেবদেবীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করল। মিলন ঘটল পৌরাণিক ও লোকায়ত দেবদেবীর। ব্যাধের দেবী চণ্ডী ব্রাহ্মণেরও পূজা পেল। যা-ছিল একসময়ে অনুচিত কর্ম, তা-ই অপরিহার্য হয়ে উঠল সামাজিক পরিস্থিতিতে।

কিন্তু এইসব দেবদেবীর মধ্যে আর্যেতর প্রভাবে রুক্ষতা, ক্রূরতা, কিছুটা নীচতারও নিদর্শন ছিল। সেগুলি যথাসম্ভব মার্জিত হল। সেই সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে একটি আত্মীয়তা কল্পনা করে তাঁদের আর্যেতর ভাবটুকুকেও যথাসম্ভব দূর করা হল। এভাবে মনসা হলেন মহাদেবের মানসকন্যা, চণ্ডী শিবের পত্নী, ধর্মঠাকুর বিষ্ণু অবতার; কখনো বুদ্ধ, শিবও সূর্যের সঙ্গেও যুক্ত। আর্যেতর দেবদেবীর এই কৌলীন্যলাভে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনে ব্রাহ্মণেরও আগ্রহ দেখা দিল। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কবিরাও রচনা করলেন মঙ্গলকাব্য। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। সুতরাং একটি বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায়, সমাজের দুঃসময়ে বাঙালীর শান্তি-বাসনায় ব্রতকথা, ছড়া, পাঁচালীর আখ্যানঅংশের মার্জনা ও সম্প্রসারণের দ্বারা মঙ্গল কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এবং মঙ্গলকাব্য সেইসব দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী যাঁদের স্থান সংস্কৃত পুরাণে ছিল না।

মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন

মঙ্গলকাব্য কাহিনীর সূত্র প্রাচীন ব্রতকথা, ছড়া ও পাঁচালী। ফলত প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির পরিচয়ই তার কাহিনী অংশে বিবৃত। মনসা মঙ্গলের নায়ক চাঁদ বেনে সওদাগর, চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক কালকেতু ব্যাধ, ধর্মমঙ্গলের নায়ক সামন্তরাজ লাউসেন। তাদেরই ভাগ্যবিপর্যয় ও দেবদেবীর প্রসাদে বিপন্মুক্তির ইতিহাস তিন মঙ্গলকাব্যের কাহিনী। অথচ বণিকবৃত্তি, শিকার উপজীবিকা ও স্বাধীন রাজত্বভোগ তখন বাঙালীর কাছে স্মৃতিমাত্র, বাস্তবে তার কোনো পরিচয় নাই। তবু এই কাহিনী ও দেবদেবী মাহাত্ম্য প্রকাশের অবসরে কবিরা সমকালীন সমাজের যেটুকু তথ্য তুলে ধরেছেন বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে তার মূল্যও কম নয় এবং মূলত তার উপর নির্ভর করেই মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস রচিত।

চতুর্দশ শতক থেকে বাংলার সংস্কৃতিতে দুটি ধর্মেরপ্রভাব—হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম। পঞ্চদশ শতকেও এই দুই ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। সে-চিত্র আছে বিদ্যাপতির কীর্তিলতায়—'হিন্দু-তুরুকে মিলল বাস। একক ধম্মে অওকে উপহাস'—হিন্দু-তুরুকের বাস নিকটে, কিন্তু একের ধর্মকে অন্যে উপহাস করে।

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর হয়েছে ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে। কালকেতুর রাজ্যের পশ্চিম অংশ হাসনহাটি—মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। সেখানে

পাঠান বসিল নানা জাত ॥

বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা

কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।

খুব ভোরে উঠে তারা নমাজ পড়ে, হাতে নেয় সোলেমানি মালা, পীরের মোকামে সন্ধ্যায় জ্বালায় বাতি। তারা কোরান পড়ে হাটে বিলায় পীরের শিরনি। প্রাণ গেলেও রোজা ছাড়ে না। 'কম্বোজ-বেশ'ধারী এদের মাথা মুড়োন, বুক-ঢাকা দাড়ি। এদের সঙ্গে কিন্তু হিন্দুদের কোনো বিরোধ নাই।

পাঠান সুলতানদের আমলে হিন্দুরাও উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন। [চতুর্দশ শতকের সুলতান জালালুদ্-দিনের মহামন্ত্রী-সেনাপতি ছিলেন হিন্দু। সুলতান পণ্ডিতপ্রবর বৃহস্পতি মিশ্রকে বিশেষ সম্মান দিতেন। হুসেন শাহর দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতন ছিলেন হিন্দু।] রাজস্ব আদায় ও এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ও জমিদারী পরিচালনায় কায়স্থদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। রুকনুদ্দিন বারবক শাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন মালাধর বসু। পুরুষানুক্রমে এই পরিবার রাজকার্য করে গেছেন। কায়স্থদের রাজকর্মের উল্লেখ করে সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম লিখেছেন: 'কায়স্থ কারকুন যত করে লেখাপড়া।' হোসেন শাহের এক সেনাপতি রামচন্দ্র খান ছিলেন কায়স্থ। কায়স্থের বুদ্ধি ও প্রতাপে রাজারাও তাঁদের সমীহ করে চলতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা তার সুযোগও গ্রহণ করতেন। [সপ্তগ্রাম মুলুকের চৌধুরীদের বার্ষিক বিশ লাখ টাকা আদায়ের সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন গোবর্ধন দাস।] বৈদ্য ও বণিকরাও উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হত। বণিকেরা যারা 'লেখা জোখা করে টাকাকড়ি' তাদের লোকঠকানোর সকৌতুক ইতিহাস আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। তবু মুসলমান রাজা ও জমিদারদের হাতে হিন্দু প্রজারা নির্যাতিত হত না তা নয়। মামুদ শরীফের নির্যাতনেই মুকুন্দরামকে গৃহত্যাগ করে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। 'নেউগি চৌধুরী নই, না রাখি তালুক।' রাজস্ব আদায় জমির মাপ নির্ধারণ সব ব্যাপারেই কিছুটা অবিচার প্রশ্রয় পেত এবং মুখ্যত ঠকত সাধারণ মানুষরাই।

ব্রাহ্মণেরা মুসলিম নীতি-পদ্ধতিকে ম্লেচ্ছ আচার বলে সযত্নে পরিহার করতেন। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ষোড়শ শতকেই একটা প্রীতির সম্পর্কে গড়ে উঠে। ক্রুদ্ধ শ্রীচৈতন্য কাজির বাড়ি দলবলসহ হাজির হলে তিনি চৈতন্যের মাতামহের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন:

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।

দেহ সম্বন্ধে হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥

মুসলমানরাও হিন্দু আচার পছন্দ করতেন না। তাঁরা মনে করতেন হিন্দু আচার গ্রহণে শাসকজাতির মর্যাদা হানি হয়। সুতরাং যবন হরিদাস যেহেতু 'যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার' তার জন্য ব্যবস্থা হয় 'ভালমতে তারে আনি করহ বিচার।' ব্রাহ্মণদের যেমন জাতিত্বের গর্ব ছিল মুসলমানরাও নিজেদের 'মহাবংশজাত' মনে করত। হিন্দুর পক্ষে চরম শাস্তি ছিল 'জাতিনাশ'। ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশে তা করা হত। কখনো লোভের বশে হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করত। কিন্তু দারিদ্র্য ও মৃত্যু অপেক্ষাও ধর্মের স্থান ছিল উচ্চে। ব্রাহ্মণ্যবর্ণের লোকের কাছে দারিদ্র্য ছিল তুচ্ছ। কৃত্তিবাস লিখেছেন 'ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড়রাত্রি উপবাসে'। মুকুন্দরাম—

তৈল বিনা কৈলু স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

তবু ধর্মকে সহায় জেনে তাঁরা দারিদ্র্যকে বরণ করেছিলেন।

বৃত্তিবিভাগ মোটামুটিভাবে মেনে চলা হত এবং মিশ্রবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি ছিল একচেটিয়া। 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন'। বাস্তব প্রয়োজনে উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের উপর কিছুটা নির্ভরশীল ছিল।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চল হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায়

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥

ন্যায় ও স্মৃতির চর্চা ছিল ব্রাহ্মণের একচেটিয়া। ব্যাকরণ-কাব্য-পুরাণপাঠ অব্রাহ্মণেও করতে পারত। উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল চতুষ্পাঠী, সাধারণ শিক্ষার জন্য টোল। দরিদ্র কায়স্থও প্রাথমিক ভাষা ও গণিত শিক্ষা দিয়ে জীবিকা উপার্জন করত। সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণ ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দ, অলংকার, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করেই পাঠে ক্ষান্ত হতেন। উচ্চ বর্ণের মহিলারাও পড়াশোনা করতেন। এমনকি তাঁদের দু-একজন কাব্যও রচনা করেছেন। চাকুরির আশায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরা বাংলা ও সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসীও শিক্ষা করত। বিশেষ তহশিলের কাজের জন্য কায়স্থকে শিখতে হত অঙ্ক। বেনেরা তেজারতি কারবারও করত।

দেশের প্রধান সম্পদ ছিল ধান। এছাড়া ছিল কুটির শিল্প, যার মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্র-শিল্প। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত অবাধে। খেয়াঘাট ছাড়া শুল্ক আদায় তেমন

হত না। পাঠান আমলে দেশের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও মোগল আমলে আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। 'আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত' অথবা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এটাই তখন হয়ে উঠেছিল সাধারণ বাঙালীর আন্তরিক কামনা। যুদ্ধবিগ্রহ, শাসক শ্রেণীর বিলাসিতা এবং বাংলার অর্থ দিল্লিতে ও বাংলার বাইরে চলে যাওয়াতেই এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে।

তুর্কী অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন এবং সেইসঙ্গে মসজিদ নির্মাণ। এর ফলে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে পড়ে এবং তারা মনে করতে থাকে এই পরিণাম ঈশ্বরেরই দান এবং স্বীয় অনাচারের ফল। ফলে 'ধর্ম হৈলা যবনরূপী' ভাবতে তাদের কষ্ট হয়নি। এরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানের আরাধ্য পীর হিন্দুর দেবতা সত্যনারায়ণ রূপে পূজিত হয়েছেন —ধর্মাচরণে হিন্দু হয়েছে কয়েকক্ষেত্রে মুসলমানের অনুসারী; যেমন ভোগ হিসাবে দেবতাকে শিরনি দান। অবশ্য চৈতন্যের আবির্ভাবে (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীঃ) নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বাঙালী হিন্দু—জাতিবিচারের নির্মমতাও দূর হয়েছিল। কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার প্রভাব পরবর্তীকালে হিন্দুর এই সমন্বয় সাধনাকে অনেকাংশে বিপর্যস্ত করে সামাজিক নানা অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের মত ব্যাপকতা লাভ না করলেও শৈবধর্মও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। [অষ্টাদশ শতকে রচিত শাক্ত সাহিত্যে আছে তার পরিচয়।]

মুসলমান শাসকেরা বিদ্বান না হলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ মহাভারত অনুবাদে, রুকনুদ্দিন বারবক সাহ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনায় প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করেন। সুতরাং মধ্যযুগের বাংলায় সংস্কৃত, বাংলা গ্রন্থরচনা ও সাহিত্য চর্চা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাধাহীনভাবে এগোতে পেরেছে। ধর্মসাধনা ও অবসরবিনোদন উভয়েরই উপায় ছিল রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি পুরাণপাঠ ও শ্রবণ, মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার মঙ্গলকাব্য শ্রবণ, পাঁচালী কথকতায় সময়-যাপন এবং বৈষ্ণবদের পক্ষে নামসংকীর্তন। এই ধর্মপরিমণ্ডলে বাস করে বাঙালী অল্পেতুষ্ট, নিরভিমানী, বিনয়ী, সংযমী ও দারিদ্র্যসহ একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিল যার আদর্শ চরিত্র রাম ও সীতা—দুঃখের বহতা ধারায় যাঁদের জীবন অতিবাহিত।

পঞ্চম অধ্যায়

মনসা মঙ্গল

মনসামঙ্গলের কাহিনী ঃ

মনসামঙ্গলের কাহিনীটি দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ দেবখণ্ড ও নরখণ্ড।

শিবের মনে সৃষ্টিবাসনা জাগায় কালিয়দহের পুষ্পবনে জন্ম হল এক সুন্দরী কন্যার। শিবের মানসকন্যা বলে তাঁর নাম হল মনসা। পদ্মবনে জন্ম বলে পদ্মা, কেয়া পাতায় জন্ম বলে কেতকা এবং সর্পবিষ হরণের ক্ষমতায় বিষহরি নামেও তিনি পরিচিত। পত্নীর সঙ্গে কলহের ভয়ে শিব তাঁকে প্রথমে নিজগৃহে না আনলেও অবশেষে মনসার আগ্রহে নিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। সেখানে মা-মেয়েতে লাগল বিরোধ। মনসার কোপ দৃষ্টিতে চেতনা হারালেন চণ্ডী, চণ্ডীর আক্রমণে এক চোখ হারিয়ে 'চ্যাং মুড়ি কানী' হলেন মনসা। অতঃপর তাঁর কৈলাসবাসের বাসনা দূর হল। জরৎকারু মুনির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল কিন্তু সে বিবাহও দীর্ঘস্থায়ী হল না। পুত্রলাভের বরপ্রাপ্ত হয়েই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটল। জয়ন্তী নগরে পুরী নির্মাণ করে স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে লাগলেন মনসা। এখানেই 'দেবখণ্ডে'র সমাপ্তি।

শিব ও চণ্ডী পূজা পান মর্তে, মনসার পূজা কেউ করে না। মনসা চাইলেন তাঁর পূজাও মর্তে প্রচলিত হোক। ভদ্রসমাজে স্ত্রীদেবতার পূজা প্রচলিত নয় বলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই তিনি প্রথম কৌশলে তাঁর পূজা প্রচার করলেন। তারপর তাঁর লক্ষ্য হল সদাগর চন্দ্রধরকে দিয়ে তাঁর পূজা করানো।

চন্দ্রধর মস্ত ধনী। স্ত্রী সনকা গুণবতী। তাঁদের ছয় ছেলে ছয় পুত্রবধূ। সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে চাঁদ বাণিজ্য করেন। তিনি শিবভক্ত। শিবকে আরাধনায় তুষ্ট করে লাভ করেছেন 'মহাজ্ঞান', যা দিয়ে মৃতকেও বাঁচিয়ে তোলা যায়। সাপ তাঁর আজন্ম শত্রু, সাপ দেখলেই হেঁতালের বাড়ি দিয়ে তিনি তাকে মারতে যান। কারণ, পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন পূজনীয় রাজা পশুসখা, সর্পবৈরিতার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর চম্পক নগরে ধন্বন্তরি, শঙ্খ প্রমুখ বিখ্যাত সাপের ওঝাও আছেন। সুতরাং মনসা একটি দুঃসাধ্য কর্মেই নিয়োজিত হলেন।

সনকাকে দিয়ে মনসাপূজা করানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় মনসার সঙ্গে শুরু হল চন্দ্রধরের সরাসরি সংঘাত। চাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তায় ক্ষুব্ধ মনসা তাঁর সাধের বাগান ধ্বংস করলেন ; মনসার কোপে মারা পড়ল নগরের সব ওঝা, এমনকি চাঁদের ছয় পুত্রও। তাঁর মহাজ্ঞান অপহৃত হল, বাণিজ্য-যাত্রায় নিমজ্জিত হল চাঁদের চোদ্দ ডিঙা। তবু চাঁদ অনমনীয়।

বৃদ্ধ বয়সে চাঁদের লখীন্দর নামে এক পুত্র জন্মাল। আসলে সে অভিশপ্ত অনিরুদ্ধ। যথাসময়ে সর্বসুলক্ষণা বেহুলার সঙ্গে তার বিবাহ হল। কিন্তু চাঁদ জানলেন বিবাহের রাতেই পুত্রের মৃত্যুযোগ আছে। তার জীবনরক্ষায় রচিত হল লোহার বাসরঘর। কিন্তু মনসার কৌশলে তাতে ছিল একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র। মনসার নির্দেশে সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কালনাগিনী দংশন করল লখীন্দরকে। পরদিন সকালে লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল। নগরীতে বইল শোকের ঝড়।

মৃত স্বামীর দেহ সঙ্গে নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেহুলা কলার ভেলায় ভেসে চললেন অজানা নদীপথে। তাঁর প্রতিজ্ঞা স্বামীকে তিনি পুনর্জীবিত করবেনই। নানা প্রলোভন ও বিপদ তুচ্ছ করে ভেসে চললেন বেহুলা। এদিকে লখিন্দরের দেহাবশেষ বলতে তখন কয়েকটি অস্থি। তাকেই কাপড়ে বেঁধে নিয়েছেন বেহুলা। অবশেষে ছ'মাস পরে বেহুলার ভেলা এসে পেঁছিল স্বর্গে নেতা ধোবানির ঘাটে। শিবের অশ্রুজাত বলে তার নাম নেত্রবতী বা নেতা। সে স্বর্গের দেবতাদের কাপড় কাচে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী সে। তা লক্ষ্য করে বেহুলা তার শরণ নিলেন। আসলে নেতা ছিল মনসার সহচরী। তার সাহায্যে বেহুলা দেবসভায় যেতে পারলেন। সেখানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে তিনি দেবতাদের মন জয় করলেন। দেবতারা তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি চাইলেন স্বামীর জীবন ভিক্ষা। শিবের আদেশে মনসা তা দিতে স্বীকার করলেন, তবে একটি শর্তে। চাঁদকে করতে হবে মনসাপুজা। বেহুলা শ্বশুরকে রাজি করাবেন এই অঙ্গীকার করে স্বামীকে ফিরে পেলেন। সেইসঙ্গে খুশি হয়ে মনসা চাঁদের ছয় পুত্রেরও জীবন দান করলেন এবং ফিরিয়ে দিলেন নিমজ্জিত ডিঙাগুলি। সব নিয়ে বেহুলা মর্তে ফিরে এলেন। বেহুলার পাতিব্রত্য ও সতীত্বের কথা রাষ্ট্র হল চম্পকনগরে। সনকার মাতৃহৃদয় অস্থির হল পুত্রমুখ দর্শনে। তিনি ছুটে এলেন ঘাটে। বেহুলা নিবেদন করলেন শর্তের কথা, হয় চাঁদকে মনসাপুজা করতে হবে, নতুবা সব নিয়ে বেহুলাকে ফিরে যেতে হবে দেবপুরীতে। পুরুষকারে অটল চাঁদ এখনো নারাজ। যে হাতে শিবের পুজা করেন তিনি, সে-হাতে কেমন করে করবেন মনসার পুজা। সকলে দেখল সমূহ বিপদ, শঙ্কিত হলেন মনসাও। অবশেষে সন্ধি হল। চাঁদ বাম হাতে পিছন ফিরে মনসার উদ্দেশে পুজার পুষ্প নিবেদন করবেন, যেখানে দেবীর ঘটের উপরে থাকবে 'চাঁদোয়া'। এতেই তুষ্ট মনসা। এভাবেই চাঁদের মনসাপুজা সমাধা হল এবং সেই সঙ্গে মর্তে মনসা পুজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হল। পাপভ্রষ্ট অনিরুদ্ধ ও ঊষা (লখীন্দর বেহুলা) কিছুকাল পরে ফিরে এলেন স্বর্গরাজ্যে। এখানেই কাব্যটির 'নরখণ্ডে'র সমাপ্তি।

মনসামঙ্গলের কবি

কবি বিজয়গুপ্ত

মনসামঙ্গলের সর্বাধিক খ্যাত কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। তিনি ছিলেন বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। কবির জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। তাঁর কাব্যরচনাকাল সম্ভবত ১৪৯৪ খ্রীঃ ঃ ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।' তাছাড়া তাঁর কাব্যে আছে হোসেন শাহের নাম। সুতরাং বাংলার সুলতান হোসেন শাহের আমলেই কাব্যটি রচিত হয়েছিল বোঝা যায়। তাঁর কাব্য বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

কাব্যকথা ঃ

বিজয়গুপ্তের কবিপ্রতিভা বিচার কিঞ্চিৎ দুরূহ। অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে গায়নরা তাঁর কাব্যকে আকর হিসাবে ব্যবহার করেছেন বেশি। ফলত তাদের হাতে 'পদ্মাপুরাণে'র প্রাচীন ভাষার প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তন ঘটেছে। কাহিনীও কতটা অপরিবর্তিত আছে বলা দুষ্কর। মূল পুথি অলভ্য হওয়াতে কবির মৌলিক রচনা-রীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা পোষণ করা কঠিন।

কাহিনী বয়নে বিজয়গুপ্ত বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। দেবতার বেনামিতে তিনি মানুষের চরিত্র এঁকেছেন এবং তাঁর চিত্রিত স্ত্রীচরিত্রগুলিই যা কিছুটা ঔজ্জ্বল্যপ্রাপ্ত হয়েছে। মনসার ঈর্ষাকাতর কোপন-স্বভাব, সনকার মাতৃহৃদয়ের ব্যথাবেদনা, বেহুলার দুশ্চর সাধনা তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মনসার ঈর্ষাকাতর স্বভাবের একটা বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি ঃ

> জনম দুখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
> যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥
> কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
> দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল ॥

দেবীর অন্তরের হাহাকারই তাহলে তাঁকে এমন ঈর্ষাকাতর ও জেদী করে তুলেছিল। বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণ বিজয়গুপ্তের অন্যতম কৃতিত্ব।

তরল হাস্যরস সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা প্রকাশিত। তাঁর কাব্যে তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু পরিচয় মেলে। ছন্দ-নির্মাণেও কবি কোথাও

কোথাও প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। শিব সম্পর্কে ক্রুদ্ধ চণ্ডীর উক্তিতে তার নিদর্শন মেলে ঃ

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥
নিজে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥

লখীন্দরের মৃত্যুর পর পুত্রহারা সনকার প্রতি চাঁদের উপদেশ তাঁর এক স্মরণীয় কবিকৃতি ঃ

শীতল চন্দন যেন আভের ছায়া।
কার জন্য কান্দ প্রিয়া সব মিছা মায়া ॥
মিছামিছি বলি কেন ডোকর আমার।
যে দিছিল লখীন্দরে সে নিল আরবার ॥

তবে কবিক্ষমতা অপেক্ষা কবিখ্যাতি লাভে বিজয়গুপ্ত ভাগ্যবান। ছাপাখানার কল্যাণে সমগ্র বাংলা দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁর প্রতিভা ও রচনা-শক্তি অনুরূপ খ্যাতিলাভের যোগ্য ছিল না।

কবি নারায়ণ দেব

মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব। তাঁর কাব্য বাংলা ও আসামে সুপরিচিত থাকলেও দীর্ঘকাল মুদ্রণ সৌভাগ্য না পাওয়ায় পরবর্তীকালে ততটা প্রচারলাভ করে-নি। তাঁর কাব্যের আত্মবিবরণী সংবলিত দু-চারটি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে। তা থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের বোরগ্রামের অধিবাসী। তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ উদ্ধারণ দেব কোনো কারণে রাঢ়দেশ ছেড়ে এখানে এসে বসতিস্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম নরসিংহ, মাতা রুক্মিণী ঃ

পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা ॥
পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি ॥

তিনি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' লিখে থাকবেন। দেবীকে স্বপ্নে দর্শনই তাঁকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

কাব্যকথা ঃ

মনসাকাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সুদীর্ঘ কাব্য রচনা করেছেন নারায়ণ দেব। কিন্তু এই বিশালতাই তার কাব্য 'পদ্মাপুরাণে'র একমাত্র গৌরব নয়, কবিত্বশক্তির পরিচয় হিসাবেও তা মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে অনন্য। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম উভয় প্রদেশেই তাঁর কাব্য ছিল সুপরিচিত। তিনটি বৈশিষ্ট্যে তাঁর রচনা ভাস্বর—পৌরাণিক প্রভাব, আশ্চর্য চরিত্রনির্মাণকুশলতা ও করুণরসের স্মরণীয় প্রকাশ।

নারায়ণদেব সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কাহিনী রচনায় তিনি মহাভারত, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ ইত্যাদি পুরাণগ্রন্থ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ফলত, মর্তলীলা অপেক্ষা পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনাতে তাঁর অনুরাগ দেখা গেছে। দেব খণ্ডে এই পৌরাণিক প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কুমারসম্ভবের কিছু অংশ তিনি সেখানে 'অবিকল গ্রহণ' করেছেন। তবু তারই অবসরে যথার্থ কবিত্বশক্তির প্রমাণ রেখেছেন কবি। কুমারসম্ভব দ্বারা প্রভাবিত 'রতিবিলাপে' তারই পরিচয় ঃ

পতি শোকে রতি কান্দে লোটাইয়া ধরণী।
কেন হেন কর্ম কৈলা দেব শূলপাণি ॥
দেবের দেবতা তুমি ভুবনের পতি।
স্ত্রী বধ[১] দিব আজি গলায় দিব কাতি ॥

চরিত্রচিত্রণেও নারায়ণ দেব বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে মুখ্য দুই চরিত্র চাঁদসদাগর ও বেহুলা চরিত্র নির্মাণে। চাঁদ অনমনীয়, নিজ বিশ্বাসে অটল, ধর্মপ্রাণ, পুরুষকারে বলীয়ান। পুত্র লখীন্দরের মৃত্যুতে যখন সকলেই শোকগ্রস্ত তার অবিস্মরণীয় মনোভাব ঃ

কি করিবে পুত্রে মোর কি করিবে ধনে।
না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে ॥

তার চারিত্রিক দৃঢ়তারই পরিচয় দেয়। কাহিনী শেষে যখন বেহুলা মৃত স্বামী, ভাসুর, জা, ও হারানো সম্পদ সহ ফিরে এসেছে এই শর্তে যে চাঁদ মনসার পূজা করবে, সকলের অনুরোধে তাতে রাজি হয়েও সে শর্ত আরোপ করেছে

পিচ দিআ বাম হাতে তোমারে পূজিব।

নারায়ণ দেবের পতিগতপ্রাণা বেহুলা আদর্শ বঙ্গনারী। কিন্তু তার চরিত্রেও আছে কোমল-কঠোরের সম্মিলন। স্বামীর মৃত্যুতে অন্তরে অনন্ত হাহাকার নিয়েও সে চেয়েছে

শাপ দিয়া বিধাতারে করোঁ ভস্মরাশি।

১. স্ত্রীলোক হত্যার পাপ

যে বিধাতা অকারণে লখীন্দরের প্রাণ নিয়েছে, অসহায় নারী বেহুলা অভিশাপকেই তার যোগ্য প্রত্যুত্তর ভেবে নিয়েছে।

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' করুণ রস মূর্ত হয়েছে স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। মদনভস্মের পরে রতিবিলাপে, লখীন্দরের মৃত্যুর পর সনকা ও বেহুলার আর্তক্রন্দনে করুণরসের সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে। মৃত স্বামীর উদ্দেশে বেহুলার উক্তিঃ

উত্তর না দেহ প্রভু নাহি কর রাও।
মুঞী অভাগিনীর দিকে চক্ষু মেলি চাও॥

সত্যই মর্মস্পর্শী। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে অকূলে ভেসে চলেছে বেহুলা। তখন তার বিলাপঃ

প্রভুরে তুমি আমি দুইজন।
জানে তবে সর্বজন॥
তুমি যে আমার প্রভু আমি যে তোমার
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার॥

প্রেম ও পতিভক্তির আদর্শ নিদর্শন; করুণরস প্রকাশেও সার্থক।

নারায়ণ দেব 'পদ্মপুরাণে' সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁর রচনায় চমৎকার ভাষার বাঁধুনি দেখা দিয়েছে। ভাষার গাম্ভীর্য ও লালিত্য যেমন এতে রক্ষিত হয়েছে, তেমনি স্থানীয় শব্দের কুশলী প্রয়োগেও রচনার প্রসাদগুণ অটুট থেকেছে। নারায়ণদেবের অন্যতম গুণ সহজ কথাও অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশঃ

বাপু ধীরে যাও পথ নিরীক্ষিয়া।
পাষাণ লাগিবে পদে পাষাণ ঠেকিয়া॥

সহজ উপদেশটিও ভাষার গুণে হয়ে উঠেছে কাব্যগুণান্বিত।

করুণরসের অনুরূপ না হলেও হাস্যরসের প্রকাশেও নারায়ণদেবের দক্ষতা ছিল। সে হাস্যরস আধুনিক কালে হয়ত কিঞ্চিৎ অমার্জিত মনে হতে পারে কিন্তু যুগবিচারে অসঙ্গত নয়।

নারায়ণ দেব মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি, মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি। তাঁর পূর্ববর্তী কবিরা শুধু মনসামাহাত্ম্য প্রচারেই নিবিষ্ট ছিলেন, নারায়ণ দেব তারই অবসরে জীবনরসের প্লাবন ঘটিয়েছেন কাব্যে। তাঁর রচনায় কারুণ্যবর্ণনা প্রথার আশ্রয় করেনি, হয়ে উঠেছে জীবনচৈতন্যে উজ্জ্বল, একান্ত স্বাভাবিক। এখানেই তাঁর রচনার মহত্ত্ব এবং তাঁর 'সুকবিবল্লভ' উপাধির যথার্থ সার্থকতা।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কবিপরিচয় ঃ

মনসা বা কেতকার দাস হিসাবে কবি ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস বিশেষণে বিশিষ্ট করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত এই শতকের শেষভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেন। দেবীর নির্দেশেই তিনি কাব্যরচনায় ব্যাপৃত হন এমন উল্লেখ তাঁর আত্মবিবরণীতে আছে। কবির আত্মবিবরণীটি বেশ দীর্ঘ, কিন্তু তাতে সন-তারিখের কোন উল্লেখ নাই।

কবিরা ছিলেন কায়স্থ ও বর্ধমানের সেলিমাবাদের অধিবাসী। তাঁর পিতা শংকর বারা খাঁ নামে এক সৎ ফৌজদারের অধীনে চাকরি করতেন। বারা খাঁ নিহত হওয়ার পর শংকর সপরিবারে ভারমল্ল নামে এক জমিদারের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন।

মনসামঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গীয় কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে সমকালীন ইতিহাসও স্থান পেয়েছে। আত্মপরিচয় অংশে বারা খাঁর হত্যার পর স্থানীয় অরাজকতার চিত্র বর্ণিত হয়েছে এবং চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপথযাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় অঞ্চলের বাস্তব ভৌগোলিক তথ্য নিপুণভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

কাব্যকথা ঃ

ক্ষেমানন্দ খুব প্রতিভাবান কবি ছিলেন না, যদিও তাঁর কবিখ্যাতি বহুপ্রসারিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যের অনেকগুলি পুথি পাওয়া গেছে, প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্যেও কবি ভাগ্যবান। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশের আগ্রহও গোপন থাকেনি। মুকুন্দরামকে তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রায় 'হুবহু নকল করেছেন' —যেমন নৌকাডুবির সময় মাঝিদের বিলাপ অংশে। মনসার কোপন ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ চরিত্র ও বেহুলার চরিত্র অঙ্কনে কিছুটা সফল হলেও চাঁদের চরিত্রচিত্রণে কবি অংশত ব্যর্থ।

যে চাঁদ 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা' কাহিনীর শেষাংশে তার সম্পর্কেই কবির উক্তি ঃ

গলায় কাপড় দিয়া সদাগর দণ্ডাইয়া
মনসারে বলে স্তুতবানী।
তুমি দেবদেবতা তুমি হরদুহিতা
তুমি দেবী ঈশাননন্দিনী ॥

পৌরুষদৃপ্ত চাঁদ সদাগরের পক্ষে মনসার এ বন্দনা তার চরিত্রকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে।

করুণ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি কিছুটা পটুতা দেখিয়েছেন। বিশেষ, করুণরসের প্রকাশে তাঁর রচনারীতি যথেষ্ট সহজ, সাবলীল ও স্বাভাবিক :

প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী।
ঘরে হৈতে শোনে তাহা সোনকা বান্যানী ॥
ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া।
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া ॥

পশ্চিমবঙ্গের মনসা-উপাসনার বৈশিষ্ট্য জানায় ক্ষেমানন্দের কাব্য সহায়তা করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সাহিত্যে ও সমাজজীবনে চৈতন্যদেব
(চৈতন্যজীবন কথা অষ্টম অধ্যায়ে)

বাঙালী সমাজজীবনে চৈতন্যের প্রভাব

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙালী সমাজজীবনে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। দিব্যপুরুষ চৈতন্যের আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রীঃ ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমার দিন, তিরোধান ১৫৩৩ খ্রীঃ। তাঁর এই স্বল্পকালীন মর্তলীলায় তাঁর বহিরঙ্গ জীবনে ঘটনার ঘনঘটা দেখা দেয়নি। তবু যা-কিছু ঘটেছে তার সবই বাঙালীর কাছে বিশেষ তাৎপর্যময়—বাঙালীর সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য—বাঙালীর সকল মানস-সম্পদের উপরই তার প্রভাব চিরকালীন। একক ব্যক্তিত্বে একটি জাতির সংস্কৃতিকে এতখানি প্রভাবিত করা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম মনীষীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

নব্যন্যায় চর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনিও ছিলেন শিক্ষক। তেইশ বছর বয়সে গয়াধামে পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তাঁর মনে দেখা দিল অপূর্ব ভাব-মাধুর্য। ভক্ত-সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরীর কাছে তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। ভাবোন্মত্ত কৃষ্ণপ্রেম-পাগল নিমাই ফিরে এলেন নবদ্বীপে। মধুময় কৃষ্ণপ্রেম শ্রীবাসের অঙ্গন ছাড়িয়ে নগরের পথে পথে ধ্বনিত হল তাঁরই উৎসাহে। নগরীর কোলাহলময় জীবনে একে অভিশাপ রূপেই গ্রহণ করল শাসকশ্রেণী। কিন্তু নিমাই-এর চেষ্টায় প্রকাশ্য নামসংকীর্তনে স্বাধীনতা পেল বৈষ্ণব সমাজ। অতঃপর চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশব-ভারতীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন নিমাই। সন্ন্যাসজীবনে তাঁর নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। পরিব্রাজক বেশে সারা ভারত পরিক্রমার পর জীবনের শেষ আঠার বছর তাঁর কাটল নীলাচলে। সেখানেই তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

চৈতন্যের আবির্ভাবের সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু ও ইসলাম দুটি ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ইসলাম ধর্ম তখন রাজার ধর্ম, রাজার প্রতাপে তারও প্রতাপ; আর হিন্দুধর্ম হয়ে উঠেছিল আচার ও মনন প্রধান ধর্ম। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক আচার দেবীতত্ত্ব ও পূজাপদ্ধতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল তুর্কী আক্রমণের ফলে। সুতরাং শক্তির জাগরণে (মানসিক ও সামাজিক) দৈবীশক্তির আরাধনায় তন্ত্রোক্ত আচারের প্রতি নিষ্ঠাই হয়েছিল তখন বাঙালীর লক্ষ্য। আচারের বিকল্প তখন বিচার। ন্যায় চর্চা বাংলাদেশে বহুল প্রসার লাভ করেছিল। চৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপই ছিল নব্যন্যায় চর্চার পীঠস্থান। এই আচার ও বিচারের সীমিত ক্ষেত্রকে আবেগের প্লাবনে চৈতন্য ভাসিয়ে দিলেন—প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মের ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগকে। বাঙালীর মননে তার ফলে যে অভাবিত পরিবর্তন দেখা দিল তাকে অনেকে 'চৈতন্য রেনেসাঁস'

অভিধায় আখ্যাত করেছেন। বস্তুত উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আগে বাঙালী সমাজ জীবনে চৈতন্যই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের বীজ বপনে সমর্থ হন।

চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, মণিপুর, দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিমে বৃন্দাবন পর্যন্ত এই ধর্মমতের বিস্তার ঘটে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, বিজয়নগরের মহামন্ত্রী রামানন্দ, চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। গৌড়রাজ হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতন চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে চৈতন্যের আবির্ভাব ভারতীয় সমাজজীবনে একটি নূতন ধর্মমতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটায় যে ধর্মের মূল কথা, 'কলিযুগে ধর্ম হয় নামসংকীর্তন', এবং 'প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে'। এই প্রেমধর্মের প্লাবনে বাঙালী সমাজ-জীবনে জমা ক্লেদ দীর্ঘদিন পরে ধুয়ে মুছে যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংকীর্ণতা ও অহমিকায় অভিমানী তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণী আত্মরক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল। বৌদ্ধরাও অনেকে ব্রাহ্মণদের নিপীড়নে উত্ত্যক্ত হয়ে একই পন্থা অনুসরণ করে। চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম তাদের জন্য একটি নূতন ধর্মের সন্ধান দিল, যে-ধর্মে জাতিভেদ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, মানুষে মানুষে ভেদ নাই, আছে পারস্পরিক প্রীতিবোধ এবং অহমিকার পরিবর্তে বিনয়। এই বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রহণীয় হয়েছিল সর্বস্তরের বাঙালীর কাছে। ফলে নূতন ভাবাদর্শে নব সমাজ সংগঠনে প্রাণিত হয়েছিল বাঙালী।

শাসক মুসলমানের কাছে সাধারণ হিন্দু ছিল উপেক্ষিত নাগরিক। তাদের ধর্মাচরণে নানা বাধা-বিপত্তি ছিল। প্রাণের ভয়ে বাঙালীও এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল। এমনকি একাংশের ধারণা ছিল, হিন্দুর পাপের ষোলকলা পূর্ণ হতেই আল্লারূপে দেখা দিয়েছেন ভগবান, সুতরাং সামাজিক অবিচার পাপের প্রায়শ্চিত্ত,—বিধাতারই বিধান। বাঙালীর এই বিচিত্র সহনশীল মানসিকতায় মনুষ্যত্বের পূতবারিধারা সিঞ্চন করলেন শ্রীচৈতন্য, উৎপীড়িতের রক্ষাকবচ। নবদ্বীপের একদল নাগরিকের আবেদনে কাজি যখন প্রকাশ্যে নামসংকীর্তন বন্ধ করার আদেশ দিলেন, শ্রীচৈতন্যের ক্ষোভ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে আদেশ প্রত্যাহার করতে হল কাজিকে। শাসকের রক্তচক্ষু পরাজিত হল দেবোপম পৌরুষের কাছে। বাঙালী জানল সহ্য নয়, প্রতিবাদই প্রতিকারের একমাত্র অস্ত্র। বাঙালীর নির্জিত জীবনে ভয়বিহ্বলতার পরিবর্তে দেখা দিল প্রাণচাঞ্চল্য।

শাসককুলের অনুকরণে অভিজাত বাঙালীজীবনে তখন ইসলামী রীতির প্রতি আনুগত্য প্রবল। অভিজাত্যের চিহ্ন হয়েই তা দেখা দিয়েছে। এর ফলে বাঙালী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তখন বিপর্যয়ের মুখে। এই সংকটের দিনে হিন্দুর সংস্কৃতি-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে বাঙালী সংস্কৃতিকে স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীচৈতন্য —জগাই-মাধাই-এর মতো দুর্বৃত্ত রাজকর্মচারীও দীক্ষিত হল তাঁর নবমন্ত্রে। সাংস্কৃতিক নবজাগরণ শ্রীচৈতন্যের স্মরণীয় অবদান।

তারই প্রভাব বাঙালীর প্রাত্যহিক সমাজ-জীবনে, তার আচারে-ব্যবহারে। বৈষ্ণবীয় বিনয়, তুলসীর গলকন্ঠী, পুরোহিতের নামাবলি, দেহে গঙ্গামৃত্তিকায় নাম ও পদাঙ্ক ধারণ, গৃহসম্মুখে তুলসীকুঞ্জ স্থাপন, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে ও মৃতের সৎকার যাত্রায় নামসংকীর্তন ইত্যাদি রীতিগুলির বহুল প্রসার তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মেরই ফলশ্রুতি।

গতানুগতিকায় রুদ্ধস্রোত সাহিত্যও পেল গতির সন্ধান। মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি প্রচলিত সাহিত্যধারা যেমন সঞ্জীবিত হল, তেমনই নবীন একাধিক ধারা সংযুক্ত হল। সঙ্গীতমুখর সমাজে আবির্ভাব ঘটল শতকবির—রচক শুধু হিন্দু নয় মুসলমানও, গায়কের ও শ্রোতার দলেও তাদের স্থান। সঙ্গীতপ্রেমে মহাসম্মিলন ঘটল হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের। সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাবে সমাজ-জীবনেও বিবর্তন দেখা দিল। এইভাবে বাঙালীর চিন্তা-ভাবনা-কল্পনায়, কর্মসাধনায় ও জীবনচর্যায় শ্রীচৈতন্য হয়ে থাকলেন এক শাশ্বত প্রাণপুরুষ।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব

বাঙালীর ধর্মে-কর্মে-মননে চৈতন্য এনেছিলেন নবজাগরণ। একটি নির্জিত জাতি তার কাঙ্ক্ষিত প্রেরণা লাভ করল চৈতন্যের আবির্ভাবে। জীবনাচরণে ও ধর্মে আচারসর্বস্বতার পরিবর্তে দেখা দিল হৃদয়ানুভূতি। অনুভবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ চিরকালই তো সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য তাই চৈতন্য জীবনী ও বাণীতে নবরসে উজ্জীবিত হল।

মঙ্গলকাব্যগুলির গতানুগতিক ধারায়, কৃষ্ণপ্রেম-আখ্যানে অথবা রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি পুরাণ-অনুবাদে উন্নত সাহিত্যিক গুণাবলীর অভাব ছিল চৈতন্যপূর্ব যুগে। চৈতন্যের সমকালে এবং পরবর্তী তিনশ' বছরে পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তিরা সাহিত্য-সেবায় অগ্রসর হলে ভাষার গাম্ভীর্য ও প্রকাশলাবণ্যে পূর্ববর্তী সাহিত্য-উপাদান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে উন্নীত হল। চৈতন্য চরিত্রের প্রভাব তখন নায়ক চরিত্রে, চৈতন্যধর্মের প্রভাব ঘটনা সন্নিবেশে। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম অথবা নারায়ণদেব, মধ্যযুগের সব শ্রেষ্ঠ কবিই বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চরিত্র-নির্মাণ করেছেন, ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন তাঁদের কাব্যে, যা ভক্তির প্রকাশ বা বৈষ্ণবীয় চিন্তারই নামান্তর। কৃত্তিবাস চিত্রিত তরণীসেন রামভক্ত, কিন্তু তার ভক্তির প্রকাশ বৈষ্ণব-রীতিরই অনুগামী। সর্বোপরি, চৈতন্য-অনুসারীদের চেষ্টায় তৎসম শব্দবহুল বাংলাভাষা তখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার উপযোগী। বৈষ্ণব কবিরা শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে বাংলায় কাব্য রচনা করতে গিয়ে তৎসম শব্দবাহুল্যে প্রচলিত সাহিত্যধারাকে তাঁরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য তো

ভাগবতের আদর্শেই রচিত। রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার রূপে পরিচিত হওয়ায় রামায়ণ-মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে বাঙালীর একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধও স্থাপিত হয়।

চৈতন্যের বাণী, 'কলিযুগে ধর্ম হয় নাম-সংকীর্তন।' তিনি ও তাঁর অনুচরবৃন্দ নাম-সংকীর্তনকে সাধনা রূপে গ্রহণ করায় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হল। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পদরচয়িতারা চৈতন্যধর্মকে আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ এই তিনশ' বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের একটি মুখ্য ধারা বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য।

এতদিন দেবতাই ছিলেন বাংলা সাহিত্যে উপজীব্য। চৈতন্যের দেবোপম চরিত্রকে উপলক্ষ করে মানব দেবতার আসন গ্রহণ করল। রচিত হল 'গৌরচন্দ্রিকা'— রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার অনুসরণে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ।

গোবিন্দ দাসের অনবদ্য পদাবলীর অনেকগুলিই গৌরাঙ্গ বিষয়ক অথবা 'গৌরচন্দ্রিকা'র পদ। চৈতন্য যেহেতু 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর', রূপে ভাবিত হয়ে একই অঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণরূপে কল্পিত হয়েছেন রাধাকৃষ্ণ-লীলানুসরণে গৌরচন্দ্রিকায় চৈতন্যের অনুরূপভাবের পদ রচিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে নব পদধারার সূচনা করল।

চৈতন্য-জীবন-মহিমা প্রচারে তাঁর জীবনী অবলম্বনে চরিত-সাহিত্যও রচিত হল। দেখা দিলেন বাংলা সাহিত্যের চরিত-সাহিত্য রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচন দাস প্রমুখ কবিগণ। মানুষের জীবনীও যে শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্যে রূপায়িত করা সম্ভব তারই নিদর্শন উপহার দিলেন তাঁরা। শুধু চৈতন্য জীবনী নয়, তাঁর অনুচর অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রমুখের জীবনী অবলম্বনেও সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ-সবই চৈতন্যের প্রভাবের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ফল।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙালী ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন। তাই এই কালপর্বে কাব্য যত রচিত হোক, ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। কাব্যের মধ্যে প্রসঙ্গত ইতিহাস আলোচনা যতটুকু আছে তা-ই আমাদের সম্বল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত অথবা তাঁর পত্নী সীতাদেবীর জীবনী নিয়ে যে চরিতসাহিত্য রচিত হয়, তাতে শুধু ব্যক্তিগত জীবন কথাই নাই, আছে সমসাময়িক ইতিহাস। সে ইতিহাস যেমন সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের, তেমনি বাঙালী সমাজেরও। চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলশ্রুতিতেই তা লাভ করা গিয়েছিল।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবিদের রচনায় বাংলাভাষার বিশিষ্ট রূপটি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু তার সাহায্যে মহৎ কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়নি। তাকে শিষ্ট সাহিত্যের উপযোগী

করা গেল চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে। বস্তুত যা ছিল গ্রামীণ সাহিত্যে সীমাবদ্ধ, চৈতন্যের প্রভাবে তা চিরকালীন সাহিত্যে রূপান্তরিত হল। পুরাতন সাহিত্যশরীরে নব লাবণ্য, নবীন চিরায়ত সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্যের নানা শাখার উদ্বোধন ও বিকাশ, চৈতন্যের অনুপম চরিত্র ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে আশ্রয় করেই দেখা দিয়েছিল।

চৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রভাবে বাংলা ভাষারই শুধু শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি, ব্রজবুলি নামক একটি কৃত্রিম সুললিত ভাষারও বিকাশ ঘটেছে। মিথিলা প্রত্যাগত শিক্ষিত বাঙালীর দ্বারাই তার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের হাতে ঘটে তার বিকাশ।

সপ্তম অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

দেবী চণ্ডীর আখ্যান সূচক কাব্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আবির্ভাব মনসামঙ্গলের পরে, কিন্তু বাংলা দেশে চণ্ডী অতি প্রাচীন দেবী। আর্য আগমনের আগে থেকেই চণ্ডী অন্ত্যজ শ্রেণী দ্বারা পূজিত হয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও (খ্রীঃ ৩য় শতক) দেবী চণ্ডীর বিস্তৃত পরিচয় আছে। ইনি অসুরদলনী, মহিষাসুরবিনাশিনী। ইনি শিবপত্নী, শিব-শক্তিও। অপৌরাণিক ও পৌরাণিক এই দুই ধারার মিলন ঘটেছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যমূলক কাব্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। এই কাব্যের দুটি কাহিনী যথাক্রমে 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ডে' বিবৃত হয়েছে। আখেটিক অর্থ ব্যাধ। এতে প্রমাণ পাওয়া যায়, দেবী চণ্ডীর পূজা প্রথমে আর্যেতর সমাজে প্রচলিত হয় এবং পরে অভিজাত শ্রেণীর (বণিক) মাধ্যমে এই পূজার প্রচলন সমাজের সর্বস্তরে ঘটে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথমে আছে হর-পার্বতীর লীলা। এই বর্ণনার পরে শুরু হয়েছে যথাক্রমে 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড'।

আখেটিক খণ্ড ঃ দেবী চণ্ডীর অভাবের সংসার। তাঁর স্বামী শিব আত্মভোলা, শ্মশানবাসী ভিক্ষোপজীবী। স্বামী-স্ত্রী সুখের মুখ দেখেন না, নিত্য করেন ঝগড়া। সহচরী পদ্মা দেবীকে উপদেশ দিলেন মর্তে পূজা প্রচলিত হলেই তাঁর দুঃখ ঘুচবে। চণ্ডী চাইলেন ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে দিয়ে মর্তে তাঁর পূজার প্রচলন। এ ব্যাপারে তিনি শিবের সাহায্যও চাইলেন। কিন্তু নিরপরাধ নীলাম্বরকে শিব মর্তে পাঠান কি করে!

দেবী নিলেন ছলনার আশ্রয়। ইন্দ্র শিবোপাসক। পূজার ফুল তোলার ভার নীলাম্বরের উপর। একদিন দেবীর মায়ায় স্বর্গের উদ্যানে কোনো ফুল দেখতে না পেয়ে নীলাম্বর মর্তে এল পুষ্পসংগ্রহে। সে দেখতে পেল ব্যাধের মুক্ত জীবন। কামনা করল সেই স্বাধীন জীবন। এদিকে তার অন্যমনস্কতার অবসরে ফুলের মধ্যে চণ্ডী কীট রূপে আশ্রয় নিলেন এবং ইন্দ্র যখন শিবের উদ্দেশে পূজার ফুল নিবেদন করছিলেন, তিনি শিবকে দংশন করলেন। বিষে কাতর শিব ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে চাইলেন ইন্দ্রকে। অবশেষে নীলাম্বরের ভুলেই ফুলে কীট থেকেছে

এবং ফুল তোলার সময় সে ব্যাধের জীবন কামনা করেছিল জেনে শিব তাকে মর্তে ব্যাধরূপে জন্মাবার অভিশাপ দিলেন। ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু রূপে জন্ম নিল নীলাম্বর, আর সঞ্চয়কেতুর কন্যা ফুল্লরা রূপে তার পত্নী ছায়া।

এগার বছর বয়সে রূপবান কালকেতুর সঙ্গে বিয়ে হল ফুল্লরার। পিতামাতার বার্ধক্যে সংসারের ভার পড়ল তাদের উপর। কালকেতু যেমন সাহসী তেমনি অব্যর্থলক্ষ্য। নিয়মিত সে পশু শিকার করে আনে আর ফুল্লরা হাটে-বাজারে সেই মাংস বিক্রি করে। অনটন সত্ত্বেও তাদের সুখী জীবন। এদিকে কালকেতুর পরাক্রমে কাতর কলিঙ্গ দেশের বন্য পশুর দল প্রাণের দায়ে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হল। দেবীও তাদের অভয় দিলেন। তিনি একদিন সোনালি গোসাপের রূপ ধরে বনের পথে পড়ে রইলেন আর মায়া বিস্তার করে অদৃশ্য করে দিলেন সমস্ত পশু-কুলকে। যাত্রাপথে স্বর্ণগোধিকা দর্শন অমঙ্গলসূচক। কালকেতু তা দেখে বিরক্ত হল এবং কোনো পশুর সাক্ষাৎ না পেয়ে তাকেই বেঁধে আনল। উদ্দেশ্য, সেদিন তারই মাংস খাবে। শিকারহীন দিনটি বিষণ্ণ করল ফুল্লরাকে। কারণ, তারা যে দিন আনে দিন খায়। ফুল্লরা চলল সইয়ের বাড়ি থেকে খুদ ধার করতে, আর কালকেতু বাসি মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে। উভয়ের অনুপস্থিতিতে বন্দী চণ্ডী রূপবতী নারীর রূপ ধারণ করে বসে রইলেন। গৃহে ফিরে ফুল্লরা তাঁকে দেখে স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হল, কালকেতু হল বিস্মিত। পরিশেষে কালকেতুর সরলতা ও অকপটতার পরিচয় পেয়ে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দিলেন সাতঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরীয়। সেই অর্থে বন কেটে প্রতিষ্ঠিত হল গুজরাট নগর। সব সম্প্রদায় ও ধর্মের লোক সেখানে সুখে বসতিস্থাপন করল। কিন্তু সেইসঙ্গে এল ভাঁড়ু দত্ত নামে এক শঠ ব্যক্তি। তার বুদ্ধি ও বাকচাতুর্যে মুগ্ধ কালকেতু তাকে সুযোগ-সুবিধা দিল, কিন্তু তারই সুযোগে সে নানা অন্যায়ভাবে অর্থাগম করতে লাগল। দেশবাসীর অভিযোগে কালকেতু তাকে নির্বাসিত করল তার রাজ্য থেকে। ভাঁড়ু দত্ত তখন পার্শ্ববর্তী রাজ্য কলিঙ্গের রাজাকে উত্তেজিত করে তাকে দিয়ে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাল। রণক্লান্ত কালকেতু যখন বিশ্রাম ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল, ভাঁড়ুর কৌশলে সে বন্দী হল কলিঙ্গরাজের হাতে এবং নিক্ষিপ্ত হল কারাগারে। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি দিলেন। তার রাজ্যও ফিরিয়ে দিলেন। দেবীর কৃপায় তার মৃত সৈন্যরাও পুনর্জীবিত হল। কালকেতু সানন্দে ফিরল নিজ রাজ্যে। উপায়ান্তর না দেখে ভাঁড়ু এবার কালকেতুকে তুষ্ট করতে মনোযোগী হল। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। কালকেতু তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। অবশ্য পরে তার সীমাহীন দুঃখকষ্ট দেখে তাকে ক্ষমাও করল। কালকেতু দেবী চণ্ডিকার মন্দির বানিয়ে মর্তে দেবীর পূজা প্রচারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করল। কিছুকাল সুখে রাজত্ব করল কালকেতু। ইতিমধ্যে তাদের অভিশাপের দিন শেষ হল, দেবীর উদ্দেশ্যও হয়েছে সিদ্ধ। পুত্রের হাতে রাজ্যপাট অর্পণ করে স্বর্গে ফিরে গেল নীলাম্বর ও ছায়া। আখেটিক খণ্ডের এখানেই সমাপ্তি।

বণিক খণ্ড ঃ

বণিক খণ্ডে অভিজাত বণিক পরিবার দ্বারা মর্তে চণ্ডীপূজা প্রচলনের কথা বলা হয়েছে।

স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা। চণ্ডী চাইলেন তাকে দিয়ে মর্তে নিজ পূজা প্রচলিত করতে। সুতরাং সুরসভায় নৃত্যের সময়ে তালভঙ্গ হল রত্নমালার। চণ্ডী তাকে অভিশাপ দিলেন। লক্ষপতি বণিকের ঘরে জন্ম নিল রত্নমালা। নাম খুল্লনা।

উজানী নগরের বণিক-প্রধান ধনপতি সদাগর। পায়রা ওড়ানো তাঁর এক শখ। একদিন তাঁর এক পায়রা আশ্রয় নিল খুল্লনার অঞ্চলে। পায়রার খোঁজে এসে ধনপতি দেখলেন খুল্লনার অতুলনীয় রূপ। ধনপতি বিবাহিত এবং তাঁর পত্নী লহনা বন্ধ্যা। ধনপতির আগ্রহে খুল্লনার সঙ্গে বিবাহ হল তাঁর। লহনার তীব্র আপত্তি দূর হল একটি পট্টবস্ত্র ও পাঁচ তোলা সোনা অলংকারের জন্য দিয়ে।

রাজার প্রিয় পাখি শুক-সারি। তাদের জন্য চাই সোনার খাঁচা। রাজা ধনপতিকে ডেকে আদেশ দিলেন সোনার পিঞ্জরের জন্য ঃ 'ধনপতি যাও ভায়া গৌড় নগরে'। ধনপতি যখন বাণিজ্যযাত্রায়, দুর্বলা দাসীর প্ররোচনায় লহনা অসীম কষ্ট দিল খুল্লনাকে। একটি জালপত্র দেখিয়ে সে খুল্লনাকে বনে বনে ছাগল চরাতে পাঠাল, শুতে দিল ঢেঁকিশালে, খেতে দিল এক বেলা আধপেটা, পরতে দিল 'খুঞা' কাপড়। এই চরম লাঞ্ছনার দিনে চণ্ডীর সহচরীরা তাকে শিখিয়ে দিল মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করতে। খুল্লনা ব্রত পালন করে দেবীর কৃপা লাভ করল। দেবীর স্বপ্নাদেশে লহনা খুল্লনার প্রতি সপ্রীতি আচরণও করল। ধনপতি দেশে ফিরে এলে খুল্লনারও সুখের দিন ফিরে এল। কিন্তু ধনপতির সঙ্গে আত্মীয়দের বিরোধ বাধল। তারা ধনপতিকে জব্দ করার জন্য জানাল ধনপতির অনুপস্থিতিতে খুল্লনা বেড়িয়েছেন বনেজঙ্গলে; হয় তিনি তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা দিন অথবা ধনপতি জরিমানা হিসাবে দেবেন এক লক্ষ টাকা। ধনপতি অর্থদণ্ড দেওয়া সমীচীন মনে করলেও খুল্লনা আপন সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করলেন। সসম্মানে তিনি উত্তীর্ণ হলেন কঠিন পরীক্ষাগুলি। লোকে ধন্য ধন্য করল।

খুল্লনার সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হল না। রাজার এবার দরকার নীলা, পলা, লবঙ্গ, চন্দন, চামরাদি। সেজন্যে ধনপতিকে যেতে হবে সিংহলে। যাত্রালগ্নে চিন্তিত খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলকামনায় ঘট পেতে চণ্ডীর পূজায় বসল। ধনপতি শিবভক্ত, স্ত্রীর চণ্ডীপূজা তাঁর সহ্য হল না। চণ্ডীর ঘট তিনি পায়ে ঠেললেন। কুপিতা হলেন চণ্ডী। সিংহলের পথে ঝড়ে ধনপতি দেবীর কোপে হারালেন তাঁর ছটি নৌকা। একমাত্র 'মধুকর' রক্ষা পাওয়ায় তিনিও প্রাণে বাঁচলেন। সিংহলের পথে কালীদহ। দেবী সেখানে সুন্দরী নারীর বেশে পদ্মের উপর বসে একটি হাতি গিলে পরক্ষণেই তাকে উগরিয়ে ফেলতে লাগলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেবীর মায়ায় দেখতে পেলেন কেবল ধনপতি। ধনপতির উপঢৌকনে সন্তুষ্ট সিংহলরাজ তাঁর

মুখে 'কমলে কামিনীর' কাহিনী শুনে বিশ্বাস করতে পারলেন না। রাজা তাঁকে মিথ্যাবাদী ভাবায় ধনপতির রোখ চেপে গেল। স্থির হল 'কমলে কামিনী' দেখাতে পারলে রাজা দেবেন 'অর্ধরাজ্য, অর্ধ সিংহাসন' ; না দেখাতে পারলে ধনপতির ডিঙার সব সম্পত্তি হবে রাজার, আর তাঁকে কাটাতে হবে বন্দীজীবন। ধনপতি কিন্তু তাঁর প্রতি দেবীর অসন্তোষে সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখাতে ব্যর্থ হলেন। সুতরাং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন তিনি।

এদিকে খুল্লনা হয়েছেন পুত্রবতী। তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত অভিশাপগ্রস্ত গন্ধর্ব মালাধর। মায়ের অশেষ যত্নে সে লালিতপালিত। মেধাবী শ্রীমন্ত গুরু দনাই-এর কাছে বিদ্যাচর্চা করে। একদিন গুরু তার নিরুদ্দিষ্ট পিতাপ্রসঙ্গ তুলে একটা কটূক্তি করলে ক্ষুব্ধ শ্রীমন্ত মায়ের আদেশ নিয়ে যাত্রা করল সিংহলে পিতার খোঁজে। একই ভাবে কালীদহে দেবীর মায়ায় সে দেখল 'কমলে কামিনী' মূর্তি এবং সিংহলরাজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখাতে না পারলে 'দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন'। রাজাও পূর্ববৎ প্রতিজ্ঞা করলেন। দেবীর অসন্তোষে একইভাবে ব্যর্থ হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল শ্রীমন্ত। সেখানে পিতাপুত্রের মিলন ঘটল। শ্রীমন্তের মনে পড়ল দেবীপূজার কথা। একাগ্রমনে সে দেবীর স্তব করল। এদিকে পুত্রের কল্যাণকামনায় খুল্লনাও চণ্ডিকার যথারীতি সেবা করছেন। ফলে তুষ্টা দেবী মশানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে শ্রীমন্তকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। তাঁরই আজ্ঞায় ধনপতি ও শ্রীমন্ত পেল মুক্তি, সিংহলরাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে বিবাহ হল শ্রীমন্তের। চণ্ডী ধনপতির সমুদ্রেডোবা ডিঙা ও ধনরত্নও ফিরিয়ে দিলেন। প্রচুর দ্রব্যসম্ভার নিয়ে দেশে ফিরল পিতা ও পুত্র, সঙ্গে বধূ। দেশে ফিরে শ্রীমন্ত রাজা বিক্রমকেশরীকেও কমলে কামিনী মূর্তি দেখাল। ফলে লাভ করল রাজকন্যা রূপবতীকে।

এতদিন ধনপতি চণ্ডীপূজা করেননি। একদিন শিবপূজায় বসে তিনি দেখলেন শিবের অর্ধাঙ্গ জুড়ে চণ্ডী শোভা পাচ্ছেন ; বুঝলেন 'দুইজনে একতনু মহেশপার্বতী'। ফলে তিনিও চণ্ডিকার সেবায় ব্রতী হলেন।

ধনপতির পরিবারদ্বারা মর্তে প্রচলিত হল চণ্ডীপূজা। চণ্ডীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। শাপান্তে স্বর্গে ফিরে গেল খুল্লনা (রত্নমালা) ও শ্রীমন্ত (মালাধর)।

কবি দ্বিজমাধব

কবিপরিচয় :

দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এক বিখ্যাত কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত' এবং কাব্যের রচনাকাল ১৫০১ শক বা ১৫৭৯ খ্রীঃ।

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজমাধব গায়ে সারদা চরিত ॥

কবি সম্রাট আকবরের নামও করেছেন, 'একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার'। সুতরাং তিনি ছিলেন আকবরের সমসাময়িক।

কবির পিতার নাম পরাশর। ত্রিবেণীর কাছে সপ্তগ্রামে তাঁর জন্ম। পশ্চিম বঙ্গে জন্মালেও কবির কাব্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত ছিল না। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও রংপুরেই তাঁর কাব্যের বিশেষ প্রচার ছিল। সম্ভবত আঞ্চলিক অরাজকতার ফলেই কবি জন্মভূমি ত্যাগ করে চট্টগ্রামে গিয়ে বসতিস্থাপন করেন। তবে তার পূর্বেই সম্ভবত তাঁর কাব্য রচিত হয়; কারণ পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ ও নদনদীর নামই সেখানে পাওয়া যায়, পূর্ববঙ্গের স্থানের নাম প্রায় অনুল্লেখিত।

কাব্যকথা ঃ

দ্বিজমাধব উচ্চ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব বাস্তব বর্ণনায় ও চরিত্রনির্মাণে। তাঁর কাব্যে কালকেতুর সংসারের দারিদ্র্যচিত্র একান্ত বাস্তবধর্মী, ধনপতির কাহিনীও তাই। দ্বিজমাধবের কালকেতু যথার্থ বীর, মুকুন্দরামের কালকেতুর ভীরুতা তার চরিত্রে অনুপস্থিত। কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসজ্জা দেখে ভয়ে ফুল্লরা স্বামীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে চাইলে

শুনিয়া যে বীরবর কোপে কাঁপে থরথর
শুন বামা আমার উত্তর।
করে লৈয়া শর গাণ্ডী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর ॥

বন্দী কালকেতু কলিঙ্গরাজের সম্মুখে নীত হলে 'বীর প্রণাম না করে'। বীরত্বের প্রবাদপুরুষ পুরুকে স্মরণ করায় তার আচরণ। শঠ ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র অঙ্কনেও দ্বিজমাধব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, 'মাধুর ভাঁড়ু দত্ত কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ।' খুল্লনা, ফুল্লরার চরিত্রনির্মাণেও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজমাধবের কাব্য সরল, অনাড়ম্বর ও বাস্তবধর্মী, এটাই তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বাঙালী জীবনের নানা খুঁটিনাটি পরিচয় একান্ত বাস্তবতায় রূপ পেয়েছে দ্বিজমাধবের কাব্যে। খুল্লনা ও লহনা খেতে বসেছে। বাঙালীর প্রিয় মাছের মুড়াটি কে খাবে তাই নিয়ে দু-সতীনে পরস্পরকে সাধাসাধি করছে। এই সুযোগে মুড়াটি গেল বিড়ালের পেটে। এ ঘটনার বর্ণনা সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন দ্বিজমাধব ঃ

মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে।
উভার উপরে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায়ে ॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে।
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে ॥

দ্বিজমাধবের কৌতুক রস পরিবেশনে দক্ষতা, বাস্তবতার প্রতি অনুরাগ এবং বাঙালীজীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলায় দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে উল্লিখিত উদ্ধৃতিটিতে।

সমকালীন অনন্য প্রতিভাধর কবি মুকুন্দরামের আবির্ভাবে স্বভাবতই তাঁর কবি-পরিচিতি খুব বেশি প্রসারলাভ করেনি।

কবি মুকুন্দরাম

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই নয়, সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। ভাষাপ্রয়োগে নিপুণতায় ভারতচন্দ্র অবশ্যই তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন, কিন্তু কাব্যের অন্যবিধ গুণাবলীর বিচারে মুকুন্দরাম নিঃসন্দেহে শ্রেয়। কাহিনী-রূপায়ণ, চরিত্র-চিত্রণও জীবনরস প্রকাশে মুকুন্দরাম প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তিনি জীবনের হলাহল পানে বিষণ্ণ হলেও শুধু করুণরসে সিক্ত করেননি কাহিনী। আবার দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়েও ভোলেননি মানুষ ও সমসাময়িক সমাজের কথা। জীবনানুরাগ তাঁর কাব্যের স্মরণীয় সম্পদ।

কবিপরিচয় ঃ

মুকুন্দরামের সংবেদনশীল মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল ব্যক্তিগত ও তৎকালীন সামাজিক দুঃখময় স্মৃতি। প্রৌঢ় বয়সে কাব্যরচনাকালে সুখের মধ্যেও সমানভাবে জাগরূক ছিল তাঁর যৌবনের দুঃখস্মৃতিজ্বালা। 'আত্মপরিচয়' অংশের প্রতি ছত্রে তারই বেদনানির্যাস।

বর্ধমান জেলার রত্না নদীতীরে দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রামে ছিল কবির আদি নিবাস। ছ-সাত পুরুষের ভিটায় 'চাষ চষি' তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। দামুন্যা ছিল সেলিমাবাজ অঞ্চলের অধীন। তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর আশ্রয়ে সপরিবারে কবি ভালই ছিলেন। রাজ্যব্যাপী অরাজকতার সুযোগে গোপীনাথ হলেন বিনাকারণে বন্দী, তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল। 'প্রজার পাপের ফলে' মামুদ-শরীফ অধিকর্তা হয়ে বসল। রাজ্য জুড়ে তখন মাৎসন্যায়। প্রজার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, তায় খাজনার পরিমাণ বহুগুণিত। 'ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে'; এক টাকার জিনিস বিকোয় দশ আনায়। রাজকর্মচারী ও মহাজন দুই শোষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে প্রজারা পালাতেও পারে না, চৌকিদার টহল দিচ্ছে। এই শোচনীয় দুঃসময়ে শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে ও গম্ভীর খাঁর পরামর্শ নিয়ে মুকুন্দরাম পত্নী, শিশুপুত্র, ভাই ও অনুচর (দামোদর নন্দী) সহ সাতপুরুষের ভিটা ছাড়লেন। মাত্র ক্রোশ দেড়েক দূরের গ্রাম ভালিঞায় রূপ রায় তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন করল। নিঃস্ব হলেন কবি। অবশ্য কবি আশ্রয় পেলেন যদু কুণ্ডু তৌলির বাড়িতে। যদু কুণ্ড 'তিন দিবসের দিল ভিক্ষা'। এর পর মুড়াই নদী (মুণ্ডেশ্বরী) পার হয়ে ভেঙুটিয়া

গ্রাম ; সেখান থেকে দারিকেশ্বর ও পরাশর নদ পার হয়ে গোচাড়িয়ায় পেঁছিলেন তিনি। তাঁর দুর্দশা তখন চরমে। তৈলহীন স্নান করে, শালুক ফুলে গৃহদেবতার পূজা করে, জলপান করে ক্ষুন্নি-বৃত্তিতেও কবির দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটল না, কারণ, 'শিশু কান্দে ওদনের তরে।' ('তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান। শিশু কান্দে ওদনের তরে') ক্ষুধার্ত শিশু তো বাবার দুঃখ বোঝে না। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শুরু হল পুনরায় পথ চলা। শিলাই নদী পার হয়ে কবি এলেন মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামে। রাজা বাঁকুড়া রায় সজ্জন। তাঁরই আশ্রয়ে সুখের মুখ দেখতে পেলেন কবি, জীবন কাটালেন তাঁরই আশ্রয়ে থেকে।
বাঁকুড়া রায় তাঁকে পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন ঃ

সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশুপাশে কৈল নিয়োজিত।

বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রাজা হলেন রঘুনাথ। তাঁরই অনুরোধে মুকুন্দরাম লিখলেন অভয়ামঙ্গল।

কালজয়ী কবিকৃতিত্বের অধিকারী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর নাম 'অভয়ামঙ্গল'। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন উপাধি লাভ করেন। সেই অনুসারে 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' নামে তাঁর কাব্যটি বিশেষ পরিচিত। কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা না গেলেও ষোড়শ শতকের শেষ দিকে কাব্যটি রচিত হয় বলে অনুমানের সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। সমসাময়িক ইতিহাস সমাজ ও সাহিত্য অপূর্ব প্রতিভায় সম্মিলিত হয়েছে 'অভয়ামঙ্গলে'। প্রায় চারশ' কবিতা ও বিশ হাজার ছত্রের এই বিপুলায়তন কাব্যটিতে 'মহাকাব্যের গুণ কিছু কিছু আছে।' ব্যক্তিক অনুভূতি ও ইতিহাসের সমন্বিত রূপ কাব্যটিতে। চরিত্রনির্মাণকুশলতারও এক অনন্য দৃষ্টান্ত কাব্যটি।

কবি মুকুন্দরামের কাব্যে সমসাময়িক সমাজ ঃ

'অভয়ামঙ্গলে'র রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। বাংলার শাসন তখন পাঠান থেকে মোগলের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার কাল। পাঠানক্ষমতা নিঃশেষিত, দিল্লির শাসনেরও সূচনা হয়নি। এই সময় দেশে চলছিল চরম মাৎসন্যায়। স্থানীয় ভূস্বামীরা বিনাকারণে বন্দী হতেন, তাঁদের সম্পত্তি হত বাজেয়াপ্ত। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলেই ছিল এই অরাজকতার শিকার। তারই সুন্দর চিত্র এঁকেছেন মুকুন্দরাম ঃ

উজির হল্য রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥

সরকার হইল কাল খিলভূমি লিখে লাল
বিনা উপকারে চায় ধুতি।
পোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥

মন্ত্রী হল রাজা, ব্যবসায়ীরও চরম দুর্দিন, ধর্মীয় শত্রুতাও ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। কোনাকুনি মেপে পনের কাঠা জমির পরিমাণকে এক বিঘা ধরে সেই অনুসারে খাজনা বসল। রাজকর্মচারীরা আনাবাদী (খিল) জমিকেও উর্বর (লাল) জমি রূপে গণ্য করে খাজনা ধার্য করল। উৎকোচ গ্রহণও চলল। মহাজনেরা টাকা-প্রতি আড়াই আনা কম দেয়, আবার নেয় চড়া সুদ। এ দুরবস্থায় প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। অথচ তারা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য নজরদার বসল ঃ

প্রজা হৈল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।

উপায়ান্তর নাই দেখে অপরিহার্য বস্তুও প্রজারা বিক্রি করে দিতে লাগল। তাতেও পেল অপ্রত্যাশিত কম দাম। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রবও বাড়ল। আত্মপরিচয় অংশে সামাজিক ইতিহাসের এই সব মূল্যবান তথ্য উপহার দিয়েছেন কবি।

কৌলীন্যপ্রথার দুঃখকর পরিণাম কাব্যটিতে চিত্রিত হয়েছে সবিস্তারে, দেবদেবীর জীবন-কাহিনীর নামান্তরে। পণপ্রথা চলিত থাকার ইতিহাসও জানা যায় মেনকার প্রতি পার্বতীর উক্তিতে। এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন কৃষিজ সম্পদের কথাও ঃ

জামাতারে বাপ মোর দিলা ভূমিদান।
তথি ফলে মসুর কাপাস মাষ ধান ॥

কৌলীন্য প্রথার মতোই ঘৃণ্য ঘরজামাই প্রথারও বর্ণনা দিয়েছেন কবি ঃ

রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত ॥

নিষ্কর্মা জামাই পরিবারের শুধু অসুবিধাই করত না, ছিল সমাজের অভিশাপ-স্বরূপ।

মুকুন্দরাম সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, নিষ্ঠাবান, দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেই পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন। কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরের মুসলমান প্রজাদের বিবরণ থেকে সমসাময়িক মুসলমানদের নানা বিভাগ সম্পর্কে জানা যায়। মুকুন্দরাম মুসলমানদের জীবনচর্যারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছোলেমানি মালা পরে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁঝ ॥

বৃত্তির বর্ণনাতে তিনি তুলে ধরেছেন তৎকালীন নানা বৃত্তির পরিচয় সে ইতিহাস এত পুঙ্খানুপুঙ্খ যে অন্য কোথাও লভ্য নয়। 'মুকুন্দরাম যেটুকু বলিয়াছেন তাহাতে***দেশের ও সমাজের চিত্রই (বিক্ষিপ্ত হইলেও) সমধিক পরিস্ফুট।'

কাব্যকথা ঃ

'অভয়ামঙ্গলে'র কাহিনী-অংশ মুকুন্দরামের স্বকৃত নয়। পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের কাঠামোয় তিনি কাব্যসরস্বতীর প্রতিমা-নির্মাণ ও তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসনিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আর এক বৈশিষ্ট্য চরিত্রনির্মাণদক্ষতায়। কালকেতু বা ফুল্লরা তাঁর কলমে নিছক ব্যাধ-মানুষী দুর্বলতা দিয়েই তাদের চরিত্র অঙ্কিত। পূর্বজন্মের দেবদেবীরূপে কোথাও তারা চিত্রিত হয়নি। দেবী চণ্ডিকা দত্ত সাতঘড়া ধনের ছ'টি ঘড়া বহনের ব্যবস্থা করে কালকেতু অক্লেশে দেবীকেই এক ঘড়া ধন বয়ে দিতে বলেছে এবং বইবার সময়ে বারে বারে সে লক্ষ্য রেখেছে দেবী যেন ধন নিয়ে না পালান।

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়॥
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী॥

তার সরলতা ও মানুষী দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়েছে তার কাজে। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় সম্ভাবনা জেনে সে আত্মরক্ষায় লুকিয়েছে—বীরত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেনি। দাত্রীকে দিয়ে কাজ করানো, তাঁকেই অহেতুক সন্দেহ, আত্মবিসর্জন দিয়ে বীর আখ্যালাভ অপেক্ষা লজ্জাকর আত্মরক্ষার চেষ্টা, কালকেতু-চরিত্রকে সরল গ্রাম্য ব্যাধরূপেই উপস্থিত করেছে। গৃহে প্রত্যাগতা ফুল্লরা আকস্মিকভাবে সুন্দরী নারীরূপে দেবীকে দেখে তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করেছে স্বামীকে, 'বারমাস্যা'র বর্ণনায় তুলে ধরেছে তার অসীম দারিদ্র্যের ছবি। সে যে সামান্য ব্যাধরমণীমাত্র কবি কখনো তা ভোলেননি।

'বান্যা' মুরারি শীল তার শঠতার চাতুর্যে এক স্মরণীয় চরিত্র। ধার শোধের চিন্তায় কালকেতুর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়নি; অথচ যখন শুনল আংটি বেচার জন্য কালকেতু এসেছে, ধার মেটাবার তাগিদ দিতে নয়, এসেই অনুযোগ করেছে কালকেতু তার বাবার মতো আর তার বাড়ি আসে না, এ বড় অন্যায় ('ধর্মকেতু দাদা সনে ছিল লেনা-দেনা। তাহা হইতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ানা'॥)। কালকেতুকে নির্মমভাবে ঠকানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। মুকুন্দরাম-চিত্রিত শ্রেষ্ঠ চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত। সে বাক্‌পটু, খল স্বভাব, স্বার্থপরচূড়ামণি।

তার বাক্‌পটুতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কালকেতুর দ্বারা অপমানিত হয়ে যখন সে কালকেতুর অতীত জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ঃ

তিন খানা শর ছিল একখান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পশরা দিত মাস ॥
ভাগ্য দোষে যদি আমি ছিলাম কাঙাল।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল ॥

কথায় সে কালকেতুর মন ভিজিয়েছে, তারপর করেছে স্বার্থসিদ্ধি। তারই পরিণামে রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়ে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করেছে সে কালকেতুর রাজ্য আক্রমণে। অবশেষে যখন দেখেছে দেবীকৃপায় কালকেতু ফিরে পেয়েছে তার রাজ্য, অবলীলাক্রমে তাকে তোয়াজ করতে গেছে।

কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে কালকেতু যখন লুকিয়েছে 'ধান্যঘরে', ফুল্লরাকে তুষ্ট করে সে-ই আবিষ্কার করেছে লুকানর জায়গা। তারপর কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছে ঃ

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী
অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

তার কূটকৌশলেই কালকেতু কলিঙ্গরাজের হাতে বন্দী হয়। ভাঁড়ু, বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। দুর্বলা দাসীর খল স্বভাব মন্থরারই অনুরূপ। তার একটি উক্তি স্মরণযোগ্য ঃ

যেই ঘরে দু সতীনে না হয় কোন্দল।
সেই ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ।।

এমনকি দেবদেবীরাও মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তব জীবনরস থেকে বঞ্চিত হননি। হর-পার্বতীর জীবনচিত্র রূপে অভয়ামঙ্গলে' যা চিত্রিত, তা বস্তুত বাঙালী পরিবারেই ছবি। মুকুন্দরামের চিত্রিত চরিত্রে তৎকালীন সমাজচিত্রেরই প্রতিফলন দেখা যায়।

মুকুন্দরামকে অনেকে বলেন দুঃখের কবি। গ্রন্থারম্ভে শিবপার্বতীর দুঃস্থ জীবন-ইতিহাস, আত্মপরিচয়ে আপন দুঃখময় জীবনকথা, ফুল্লরার বারমাস্যায় ব্যাধজীবনের দারিদ্র্যের উজ্জ্বল ছবি, এমনকি আতঙ্কিত পশুদের মুখেও দুঃখ-নিবেদনের প্রসঙ্গ, 'আখেটিক খণ্ডে'র কাহিনীকে দুঃখময় করে তুলেছে। বণিক খণ্ডে'ও ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীমন্ত বৃত্তে ঘিরে মূলত দুঃখেরই সাধনা। বস্তুত যুগ-প্রভাবিত-কবি চরিত্র বা কাহিনী রচনার কালে আপন দুঃখময় অভিজ্ঞতাকে ভুলতে পারেননি। তাঁর মতো আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন কবির পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। তাই করুণরসের প্রাধান্য তাঁর কাব্যে। তবু শিল্পী হিসেবে তিনি মহত্তম, সকল রসই সমান দক্ষতায় পরিবেশিত তাঁর কাব্যে, যদিও সেখানে করুণ ছাড়া 'অন্যরসের স্থান সংকুচিত।'

অষ্টম অধ্যায়
চৈতন্য জীবনী ও জীবনচরিত-কাব্য

শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথা ঃ

কবি বলেছেন বাঙালীর হৃদয়-অমৃত মন্থন করে 'নিমাই ধরেছে কায়া।' বস্তুত-পক্ষে, চৈতন্যের হৃদয়-অমৃতেই বাঙালী-জীবন নবরূপে গঠিত হয়েছে ; বাঙালীর চিন্তা, কর্ম, ধর্ম, সাহিত্য সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়েছে চৈতন্য-জীবন ও বাণীর অপূর্ব মাধুরীতে। শ্রীচৈতন্য জীবদ্দশাতেই অবতার রূপে পূজিত হয়েছেন, তাঁর মানবলীলার মধ্যে ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ খুঁজে পেয়েছেন দৈবীলীলার প্রতিচ্ছায়া। মানবতা উত্তীর্ণ হয়েছে দেবত্বে, দেবতার লীলা-আখ্যান ছেড়ে কবি দেবোপম মনুষ্যজীবনী নিয়ে জীবনীসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে মানবজীবন ও দেবমহিমাকে একাকার করে দেখেছেন।

চৈতন্যের মর্তজীবনলীলার শুভ সূচনা ১৪৮৬ খৃীঃ ২৭ শে ফেব্রুয়ারী দোল-পূর্ণিমার দিন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের আদি নিবাস ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। এখানেই নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জগন্নাথ ও শচী দেবী ছিলেন কয়েক সন্তানের জনকজননী। জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ শৈশবে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র নিমাই ছাড়া বাকি সকলেই শৈশবে মারা যান।

নিমাই শৈশবে ছিলেন দুরন্ত অথচ মেধাবী। স্বল্পকালেই ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় ইত্যাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন তিনি। সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপে একটি টোলও খুললেন। তখন তাঁর বয়স আনুমানিক কুড়ি বছর। শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিমান নিমাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে আপন পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রসারিত করলেন। পিতৃভূমি শ্রীহট্ট দর্শনের পর গৃহে ফিরে প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যুর দুঃসংবাদ সংসার-বৈরাগ্যের প্রথম স্বাদ আনল তাঁর জীবনে। তবু মাতৃইচ্ছায় দ্বিতীয় বার তিনি দার পরিগ্রহ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। ১৫০৮ খৃীঃ এর কাছা-কাছি সময়ে গয়ায় পিতৃপিণ্ড দান কালে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তাঁর মনে দিব্যভাবের উন্মেষ হল, লৌকিক সংসারের মায়াবন্ধন হয়ে গেল ক্ষীণ ; ঈশ্বর পুরীর কাছে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গৃহে ফিরলেন তিনি। শিক্ষাভিমানী নিমাই তখন কৃষ্ণকথায় কাল কাটান। তিনি টোল তুলে দিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, মুরারি, মুকুন্দ, গদাধর প্রমুখকে নিয়ে গড়ে উঠল এক কৃষ্ণভক্তগোষ্ঠী। শ্রীবাসের অঙ্গন মুখরিত হল সংকীর্তনে, নবদ্বীপের রাজপথও। কীর্তনে বিরক্ত প্রতিবেশী ও নগরবাসী অভিযোগ করল কাজির কাছে। নিমাই পেলেন কাজির সমর্থন। অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণই সমুচিত বিবেচনা করে কাটোয়ায় কেশবভারতীর

শিষ্যত্ব বরণ করলেন তিনি। তাঁর নবনামকরণ হল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। তাঁর বয়স তখন পূর্ণ চব্বিশ (১৫১০/খ্রীঃ মাঘ মাস)।

এবার যাত্রা নীলাচলে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব, প্রগাঢ় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, বৈষ্ণব মতে অনুরক্ত হলেন। পুরীতে আঠারো দিন কাটিয়ে শ্রীচৈতন্য চললেন দক্ষিণ ভারতভ্রমণে, সঙ্গে অনুচর কৃষ্ণদাস। এক বছরেরও অধিককাল ধরে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণে তাঁর ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হল, ঘনিষ্ঠতা জন্মাল রায় রামানন্দের সঙ্গে, স্বমতে আনলেন পণ্ডিতপ্রবর বেঙ্কটভট্টকে। নীলাচলে তাঁর দ্বারা এবং বাংলায় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের দ্বারা তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করল।

শ্রীচৈতন্য চললেন বৃন্দাবন পরিক্রমায় (১৫১৩ খ্রীঃ)। পথে শেষবারের মতো এলেন বাংলাদেশে; মাতৃদর্শনও ঘটল। রামকেলিতে রাজা হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতনকে স্বমতে আনলেন। সঙ্গী ভক্ত-অনুরক্তের বিশাল দলকে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত পরিক্রমা সমীচীন নয় বলে তাঁদের রেখে যেতে ফিরলেন নীলাচলে। পর বৎসর (১৫১৪ খ্রীঃ) মাত্র দুজন সঙ্গীসহ যাত্রা করলেন বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন। পরবর্তীকালে ষট্‌গোস্বামীর সহায়তায় বৃন্দাবনেও তাঁর ধর্মের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

১৫১৫ থেকে ১৫৩৩ খ্রীঃ জীবনের শেষ-আঠারো বছর তাঁর কাটল নীলাচলে কাশীশ্বর মিশ্রের আশ্রমে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে। শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীচৈতন্য দুটি নাম অভিন্নরূপ পেল বাঙালী জীবনে। আটচল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই (১৫৩৩ খ্রীঃ) রহস্যাবৃতভাবে ঘটল তাঁর মর্তলীলার অবসান।

বৃন্দাবন দাস ও চৈতন্যভাগবত

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বাংলাভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য। কাব্যটির নাম নাকি প্রথমে দেওয়া হয় 'চৈতন্যমঙ্গল', পরে এই নাম পরিবর্তিত হয়।[১] দুটি কারণ এ সম্পর্কে উল্লিখিত হয়: সমসময়ে লোচনদাসও একই নামে একটি চৈতন্যজীবনী-কাব্য রচনা করেন; তাই বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী এই নাম পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। অন্যমতে চৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলার ধারা অনুসৃত হয়েছে বলে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা 'চৈতন্যভাগবত' নাম পছন্দ করেন।[২]

---

১. বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥ (চৈতন্যমঙ্গল)
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥ (ঐ)

২. চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥ (প্রেমবিলাস)

এই জীবনীকাব্যটির রচয়িতা বৃন্দাবন দাস। তিনি শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিনীর কন্যা নারায়ণীর পুত্র। 'বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন' বলেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বৃন্দাবনের জন্ম ১৫১৯ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে। সম্ভবত ১৫৪২ খ্রীঃর পরে এবং ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে কবি তাঁর কাব্যরচনা সম্পূর্ণ করেন। তাঁর শেষজীবন কাটে দেনুড় গ্রামে। ১৫৮০-র কাছাকাছি সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। কবি ছিলেন চিরকুমার।

শ্রীবাসের অঙ্গন ছিল চৈতন্যের সংকীর্তন-স্থান, মাতা নারায়ণীও বৈষ্ণবভাবে ভাবিত। সুতরাং বৈষ্ণব পরিমণ্ডলেই বৃন্দাবনের জন্ম ও লালন-পালন। অল্প বয়সেই তিনি নিত্যানন্দের সঙ্গলাভ করেন, তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন। গুরুর কাছে বৃন্দাবন পান দীক্ষা ছাড়াও চৈতন্য-জীবনীর 'অধিকাংশ উপাদান।' গদাধর ও অদ্বৈতাচার্যও তাঁকে এ-বিষয়ে সাহায্য করে থাকবেন। ফলে চৈতন্যজীবনীর উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৃন্দাবন বিশেষ ভাগ্যবান ছিলেন এবং তাঁর সংগৃহীত তথ্যও মূল্যবান।

গুরু ও গুরুতুল্য ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়া বৃন্দাবনের সম্মুখে আদর্শ হিসাবে ছিল মুরারি গুপ্তের কড়চা ও শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-জীবনকে তিনি ভাগবতের কৃষ্ণলীলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বর্ণনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে চৈতন্য-নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-বলরাম। সেই বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি নিয়ে তিনি কাব্যটি রচনা করেছেন। ফলত অলৌকিকত্ব এসে জীবনীর বাস্তবতাকে গ্রাস করেছে, যদিও রচনার প্রাণবেগ তাতে ব্যাহত হয়নি।

চৈতন্যভাগবত তিন খণ্ডে ও একান্ন অধ্যায়ে বিভক্ত সুবৃহৎ জীবনীকাব্য। ছত্রসংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। আদি খণ্ডে (পনেরটি অধ্যায়) গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী স্থান পেয়েছে; মধ্য খণ্ডে (সাতাশটি অধ্যায়) সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত এবং অন্ত্যখণ্ডে (দশটি অধ্যায়) গুণ্ডিচাযাত্রা পর্যন্ত আখ্যান বিবৃত। চৈতন্যের অন্ত্যলীলা অজ্ঞাত কারণে বৃন্দাবন অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যের সহচরেরা অনেকেই তখন জীবিত, কবিও তাঁদের ঘনিষ্ঠ। তবু চৈতন্যতিরোধান সম্পর্কে তাঁর নীরবতা বিস্মিত করে।

বৃন্দাবন সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর জীবনীকাব্যটিকে রূপ দিয়েছেন।

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে॥

সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল, ভাগবতে ছিল স্মরণীয় অধিকার। তবু বৃন্দাবনের ভাষা জটিল নয়, প্রাঞ্জল। সুর ও তালে আবৃত্তি এবং অংশত

গানের উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচিত। তাই মাঝে মাঝে রাগরাগিণীরও উল্লেখ আছে।

চৈতন্য কবির মতে ভগবান। স্বাভাবিকভাবে এ কাব্যে দেবলীলা মানবীয় মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে, কিন্তু তবু নিপুণ বাস্তব বর্ণনায় বৃন্দাবন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশেষ, চৈতন্যের বাল্যলীলায় বাস্তবতা প্রশংসনীয় দক্ষতায় বর্ণিত হয়েছে। ষোড়শ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল হিসাবেও কাব্যটির মূল্য অপরিসীম। কাব্যটির ত্রুটি চৈতন্যের শেষ জীবন সম্পর্কে কবির নীরবতা এবং নিত্যানন্দ-বিরোধীদের প্রতি অতিরিক্ত অসহিষ্ণুতা। কিন্তু চৈতন্যের দিব্যজীবনলীলাকে নিবিড় আন্তরিকতায় বর্ণনা করায় জীবনীকাব্যটি বৈষ্ণবদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' আছে জীবনীর সঙ্গে দর্শনের প্রাধান্য। ফলে সাধারণ বৈষ্ণবের কাছে তা যতটা পূজ্য ততটা প্রিয় নয়। ভাষার সরলতায় ও ভক্তিবিগলিত আবেগের প্রবাহে 'চৈতন্যভাগবত' সর্বলোকসাধারণের চিত্তজয় করেছিল। এখানেই বৃন্দাবনের কৃতিত্ব। তাঁকে বলা হয় 'চৈতন্যলীলার ব্যাস'—প্রথম বাংলা জীবনীকার হিসাবে ও জনপ্রিয়তায় কারণে এ গৌরব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

জীবকে উদ্ধারের জন্য অবতার রূপে চৈতন্যের মর্তে আগমন—এ ভাবেই চৈতন্য জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন কবি। কিন্তু শুধু চৈতন্যজীবনচিত্রণে ও ব্যাখ্যায় বৃন্দাবনের শ্রম নিঃশেষিত হয়নি। তিনি সমকালীন সমাজেরও নানা তথ্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। সেকালের হিন্দু, বৈষ্ণব ও মুসলমান সমাজের কথা জানা যায় তাঁর কাব্য থেকে। চৈতন্য পরিকর ও ভক্তদের কথাও বৃন্দাবন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সমকালে নবদ্বীপ ছিল সমৃদ্ধ নগরী। সেখানে চলত নানাভাবে ধর্মাচরণ। এমন কি প্রভূত ব্যয়ে মূর্তি নির্মাণ করেও পূজা হত ঃ

ধর্ম কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥

বৃন্দাবনের কাব্যে বৈষ্ণব সমাজ ছাড়াও সব ধর্মের কথা, বাঙালীর লোকাচার, কুসংস্কার, আচার, বিশ্বাস, অবসর যাপনের উপায় বর্ণিত হয়েছে। সমকালীন ইতিহাসের আকর গ্রন্থরূপেও তাই চৈতন্যভাগবতের মূল্য অপরিসীম।

লোচন দাস ও চৈতন্য মঙ্গল

লোচন দাস

লোচনানন্দ দাস বা লোচন দাস বিরচিত চৈতন্যজীবনীকাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। কাব্যটি 'চৈতন্যভাগবতে'র মতো অংশত গেয় নয়, সর্বাংশে গেয়। সেইজন্য আদ্যন্ত রাগরাগিণীরও উল্লেখ আছে। 'চৈতন্যমঙ্গল' পণ্ডিতের জন্য লিখিত নয়, জনমনোরঞ্জনের জন্য গীত হিসাবেই রচিত এবং জনসমাজে কাব্যটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

লোচনের পিতা কমলাকর দাস এবং মাতা সদানন্দী। বর্ধমান জেলার কোগ্রামে ছিল কবির নিবাস। পিতৃ ও মাতামহ বংশের একমাত্র পুত্রসন্তান হিসাবে লোচন ছিলেন খুব আদুরে। মাতামহের চাপে বাধ্য হয়েই তাঁকে পড়াশুনায় মন দিতে হয়। লোচন নাকি নিত্যানন্দের আদেশে বিবাহ করেন। তাঁর পত্নীর নাম কাঞ্চনা। তিনি শ্রীখণ্ড গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও চৈতন্য-অনুচর নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' ১৫৫০ থেকে ১৫৬৬ খৃীঃর মধ্যে কোনো এক সময়ে রচিত হয়।

লোচনের কাব্য আকারে অন্য জীবনীগ্রন্থের তুলনায় ক্ষীণকায়, ছত্রসংখ্যা প্রায় এগার হাজার। কাব্যটি চারটি খন্ডে বিভক্ত—'সূত্র খণ্ডে' অবতার বর্ণনা, 'আদি খণ্ডে' গয়াগমন পর্যন্ত বর্ণনা, 'মধ্য খণ্ডে' বাসুদেব সার্বভৌমের প্রতি কৃপা পর্যন্ত বর্ণনা এবং শেষ খণ্ডে দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে তীর্থযাত্রার কথা স্থান পেয়েছে। 'সূত্র খণ্ডটি অভিনবত্বে এবং চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবনের বিস্তারিত পরিচয়ে বিশিষ্ট। কিন্তু 'চৈতন্যমঙ্গলের' ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে লোচনের উক্তি—তিনি জগন্নাথদেবের শরীরে লীন হন :

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

—প্রমাণ অপেক্ষা লোকশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই লিখিত।

চৈতন্যমঙ্গল ইতিহাস-নির্ভর জীবনীকাব্য না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে জনচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। কারণ, লোচনের কবিপ্রতিভা। গানের লক্ষ্য ইতিহাস অথবা বিশ্বস্ত জীবনচিত্র নয়, শ্রোতার মনোরঞ্জন। অন্তত সেটুকু কৃতিত্ব লোচনের প্রাপ্য। তবে বৈষ্ণব ধর্মের শাখাবিশেষের মতামত ও সাধনপ্রণালী উল্লিখিত হওয়ায় ঐতিহাসিকের কাছেও কাব্যটির মূল্য আছে।

কবি জয়ানন্দ ও তাঁর চৈতন্যমঙ্গল

জয়ানন্দের চৈতন্যজীবনী 'চৈতন্যমঙ্গল' বৈষ্ণব সমাজে অনাদৃত হয়ে দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। কাব্যটি গেয়, তাই রাগরাগিণীযুক্ত। অলৌকিক

বর্ণনার আধিক্য ও অপ্রামাণিক ইতিহাসের বিস্তার কাব্যটিতে পাওয়া যায়। কবি 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনায় চৈতন্যজীবনীকে মঙ্গল কাব্যের ধাঁচে সাজিয়েছেন।

জয়ানন্দের জন্ম বর্ধমান জেলার আমপুরিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী। চৈতন্য পুরী থেকে বাংলাদেশে ফেরার সময় সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। জয়ানন্দ নামটি নাকি চৈতন্যদত্ত। ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কাব্যটি রচিত হওয়া সম্ভব।

ন'খণ্ডে বিভক্ত 'চৈতন্যমঙ্গল' মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতিতে সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে শুরু হয়েছে। 'নদীয়া খণ্ডে' সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের কিছু পরিচয় দিলেও কবি সুলতানের অন্যায়-প্রতিকারে দেবী কালিকার অবাস্তব হস্তক্ষেপ বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে কবির বক্তব্য রথযাত্রার দিন রথের অগ্রভাগে নাচতে নাচতে ইঁটের টুকরায় আহত চৈতন্য অসুস্থ হন এবং ষষ্ঠ দিবসে ইহলীলা সংবরণ করেন ঃ

ইটল বাজল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শরণ অবশেষে ॥

এ কাহিনী হয়ত যুক্তিগ্রাহ্য, কিন্তু প্রামাণিক কি না নিঃসংশয়ে জানা যায়নি। বৈষ্ণবরাও এ কাহিনী বিশ্বাস করতেন না—'চৈতন্যমঙ্গলে'র অনাদরের অন্যতম কারণ চৈতন্যজীবনের এই অন্তিম কাহিনী বর্ণনা।

জয়ানন্দের না-ছিল কবিত্বশক্তি, না ইতিহাস-নিষ্ঠা। এমন কি গদাধরের কাছে দীক্ষিত হয়েও তিনি চৈতন্যতত্ত্ব ও বৈষ্ণব সাধনা সম্পর্কে তাঁর কাব্যে কিছু বলেননি। পরন্তু দেবদেবীর বর্ণনা ও শাক্তদেবীর (কালী) মহিমা-প্রচার করে স্বধর্মীদেরও তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন। ফলত 'চৈতন্যমঙ্গল' একটি অসার্থক চৈতন্যজীবনীকাব্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য সম্পদ। জীবনী ও ইতিহাস, দর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্ব, যুক্তি ও ভক্তি, বিদ্যা ও বিনয়, কবিত্বশক্তি ও পরিশ্রমের অপূর্ব মহাসম্মিলন ঘটেছে এই অমূল্য গ্রন্থটিতে। ভক্ত ও জিগীষু সকলেরই আকাঙ্ক্ষা আশাতীতভাবে পূরণ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

কবিপরিচয় ঃ

বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিল। মোটামুটি সচ্ছল ও ধর্মানুরাগী পরিবারে তাঁর জন্ম। গৃহদেবীর নিয়মিত পূজা ও মাঝে মাঝে

সংকীর্তনাদির ব্যবস্থা করেছিলেন কৃষ্ণদাস। তখন বৈষ্ণব সমাজের একাংশ নিত্যানন্দের প্রতি নানা কারণে শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করতেন না। কৃষ্ণদাসের ভ্রাতাও এই দলভুক্ত ছিলেন ঃ

চৈতন্য প্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস-আভাস ॥

একবার বাড়িতে অহোরাত্র সংকীর্তনের সময় তাঁর ভ্রাতা নিত্যানন্দ-ভক্ত রামদাসের প্রতি কটূক্তি করাতে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন। সেদিন-ই রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন নিত্যানন্দকে, 'নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে।' সেইসঙ্গে পেলেন স্বাপ্নাদেশ ঃ

বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব লভ্য হয়।

সেই অনুসারে অকৃতদার কৃষ্ণদাস গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। এই স্বপ্নাদেশ তাঁকে এত অভিভূত করেছিল যে নিত্যানন্দকে তিনি গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করতেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে তাঁদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনায় মনোনিবেশ করেন। কবি তখন বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ঃ

নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বলিতে না পারি।
পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি ॥

তবু অসীম সাহসে ভক্তির প্রাবল্যে তিনি এই পরিশ্রমসাধ্য কাজ অকুণ্ঠিতচিত্তে কাঁধে তুলে নেন। কবির দীর্ঘ ন'বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল কাব্যটি। ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ দিকে কাব্যটি রচিত হয়।

কাব্যকথা

'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যজীবনের অন্ত্যলীলা অনুক্ত ; আবার বৃন্দাবনের গোস্বামী-দের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব শুধুমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থেই সন্নিবেশিত। সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞানহীনের তাতে অধিকার নাই। এই দুই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণদাস কাব্যরচনায় ব্রতী হন। 'চৈতন্যজীবনের গভীর তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও পরিণাম, আর তারই সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র, দর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্বকথার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।' কবি চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত চৈতন্যজীবনী সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে অন্ত্যলীলার বিস্তৃত বর্ণনার সুযোগ নিয়েছেন। তবু কাব্যটি হয়েছে বিশালায়তন।

কাব্যটির অন্যতর বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণদাসের বৈষ্ণবীয় বিনয় ও বৃন্দাবন দাসের প্রতি শ্রদ্ধাভাব। প্রগাঢ় পন্ডিত কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জানিয়েছেন ঃ

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুই পানে ॥

আর বৃন্দাবন দাসকে তিনি বলেছেন 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' ঃ

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥

তথাপি চৈতন্যভাগবত রচনার পরেও যে তিনি কাব্য রচনায় ব্রতী হন তার কারণ চৈতন্যভাগবতে নাই চৈতন্যের অন্ত্যলীলার বিবরণ। চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার তাৎপর্য বৈষ্ণবের কাছে মহামূল্যবান বিষয়। এই অমূল্য তথ্যের পরিবেশনের জন্যই বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ 'বৃদ্ধজরাতুর' কৃষ্ণদাসকে কাব্য রচনায় অনুরোধ করেন।

'চৈতন্যভাগবতে'র মতো 'চেতন্যচরিতামৃত'ও তিন খন্ডে বিভক্ত। তবে এখানে 'খন্ডে'র পরিবর্তে 'লীলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আদিলীলায় সতেরটি, 'মধ্যলীলায় পঁচিশটি এবং 'অন্ত্যলীলা'য় বিশটি পরিচ্ছেদ। 'আদিলীলা'য় চৈতন্যের যৌবন পর্যন্ত, মধ্যলীলায় সন্ন্যাস গ্রহণের পরের ছ' বছরের কাহিনী এবং অন্ত্যলীলায় পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত। কাব্যটির কোনো অংশই গানের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম পঠনীয় অর্থাৎ অগেয় গ্রন্থ।' সঙ্গীতের আবেশ ও মূর্ছনা এবং দেবী আখ্যানের ভাবালুতা ছেড়ে যুক্তিনিষ্ঠায় বাঙালীর প্রথম উত্তরণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'।

কৃষ্ণদাসের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশ। এপ্রসঙ্গে তাঁর উপলব্ধি শক্তির প্রগাঢ়তাও কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সহজ কথা যায় না কহা সহজে।' কিন্তু কৃষ্ণদাস প্রমাণ করেছেন কঠিন তত্ত্বকথাও কত সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

* * *

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্বর ॥

বৈষ্ণবীয় মতের এমন সরল অথচ গূঢ় উপস্থাপনা অন্যত্র দুর্লভ। প্রায় প্রবচন রূপে পরিচিত ওপরের পংক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বৈষ্ণব-লক্ষ্য-ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

বাঙালী-মনীষার এক অনন্য প্রকাশ 'চৈতন্যচরিতামৃত।' কৃষ্ণদাস ঘটনার পূর্বাপরতা সর্বত্র রক্ষা করতে পারেননি, কখনো-বা আপন অনুভবকে চৈতন্যের মুখে স্থান দিয়েছেন। এইসব সামান্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও চৈতন্যের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সুষমামণ্ডিত প্রকাশে, নিগূঢ় তত্ত্বের মনীষা-দীপ্ত ব্যাখ্যায় এবং মানবরূপী দেবোপম চৈতন্যের অমৃতচরিতকথায় চৈতন্যচরিতামৃত অনন্য গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কোনো ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম উপলব্ধিকে পয়ারে আবদ্ধ করেননি, একটি ধর্মীয়-গোষ্ঠী বা সমাজের অথবা বলা শ্রেয় ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষিগণের দর্শনচিন্তাকে সরস উপমাশ্রিত ভাষায় সুবোধ্য করে তুলেছেন। একটি গ্রন্থে এতটা প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত। জীবনী গ্রন্থ হিসেবে চৈতন্যচরিতামৃত চির-অম্লান গ্রন্থ।

নবম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী

বাঙালী প্রাণের একতারাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ঝংকার তুলেছে বৈষ্ণব পদসঙ্গীত। চৈতন্যানুসারী বৈষ্ণব ধর্মকথার সঙ্গীতরূপই বৈষ্ণব পদাবলী। কিন্তু বাঙালীর রোম্যাণ্টিক অনুভবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে এরই মাধ্যমে। যে-কোন সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য প্রেম। প্রেমের বিচিত্র লীলা, রহস্য ও জ্বালা বৈষ্ণব পদাবলীতে যত নিখুঁতভাবে চিত্রিত, এমনটি অন্যত্র দুর্লভ।

রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয় হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল চৈতন্য আবির্ভাবের আগেই। বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যান কাব্যে, মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমই উপজীব্য। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৈষ্ণবদর্শনের কথা নাই, শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও নাই রাগানুগা সাধনার কথা। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হন নি। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা গেল একটি ধর্মগোষ্ঠীর সাধনার কথা, অর্থাৎ এই সব কবিরা আগে বৈষ্ণব, পরে কবি ; বৈষ্ণব তত্ত্বকথাকে সঙ্গীতে রূপ দেওয়াতেই তাঁরা মনোযোগী। 'বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য।'

বৈষ্ণব ধর্ম যেমন ষোড়শ শতকে বাঙালী সমাজজীবনে নব জাগরণের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকাও অনুরূপ। বৈষ্ণবপদাবলীর রসধারায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই শুধু আনন্দাপ্লুত হয়নি, পরবর্তীকালে রচিত সব সঙ্গীতেই আছে বৈষ্ণব পদের প্রভাব। এই 'সর্বগ্রাসী আবেগবাদী প্রেমধর্মের' প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি শাক্তসঙ্গীত। কবিগণের মার্জিত অংশটুকুতে বৈষ্ণব পদাবলীরই অনুরণন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদের মতো সঙ্গীত রচয়িতারাও বৈষ্ণবপদাবলীর কথা ও সুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বৈষ্ণব পদসাহিত্য বাংলার সাহিত্যাকাশে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি।' সমকালীন মঙ্গলকাব্য কল্পনার দূরাভিসারে সমৃদ্ধ নয়; একান্তভাবে গ্রামীণ সাহিত্য ; অনুবাদ সাহিত্য পুনরাবৃত্তি-ভারাক্রান্ত। 'একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীই দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া নিখিল মানবচিত্তের মধ্যে ঠাঁই পাইয়াছে।' বৈষ্ণব পদসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই যথার্থ এবং স্মরণীয় :

> 'তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া একমুহূর্তে দূর হইল, অলংকার শাস্ত্রের পাষাণবন্ধন সকল কেমন করিয়া একমুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল ? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে,

প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীত প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।'

বৈষ্ণব পদাবলী প্রধানত সঙ্গীত। তার প্রকাশ কীর্তন গানে। কীর্তনের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি পালা কীর্তন; একই পর্যায় বা ভাবের পদগুলিকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে গাওয়াই পালাকীর্তন। চৈতন্য তিরোধানের পর খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তম দাস পালাকীর্তনের রীতিটেকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান।

গৌরচন্দ্রিকা ঃ বৈষ্ণব পদাবলী শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ নয়। এর দুটি ধারা—একটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, অন্যটি চৈতন্যবিষয়ক। পদকর্তারা যাঁরা 'মহাজন' অভিধাতেও অভিষিক্ত, রাধাকৃষ্ণ লীলার অনুসরণে চৈতন্য বিষয়ক পদরচনাও করেন। চৈতন্যের রাধাভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যে-সব পদ রচিত হয় এবং রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পালাকীর্তনের সময়ে চৈতন্যপ্রাসঙ্গিক অনুরূপভাবের যে-সব পদ প্রারম্ভে গীত হত এবং এখনও হয়, তার সাধারণ নাম 'গৌরচন্দ্রিকা'। বলাবাহুল্য, চৈতন্য-বিষয়ক সব পদই 'গৌরচন্দ্রিকা' নয়। গৌরচন্দ্রিকার বাইরে চৈতন্যজীবনী ও চৈতন্য-পরিকরদের নিয়েও নানা চৈতন্য বিষয়ক পদ আছে।

ব্রজবুলি ঃ বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা ও ব্রজবুলি দুটি ভাষায় রচিত। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার কবি। মৈথিলী ভাষায় তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অপূর্ব পদ রচনা করেন। মিথিলা প্রত্যাগত বাঙালী ছাত্রেরা এই সব পদ কণ্ঠস্থ করে এনে বাংলা-দেশে প্রচার করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পদগুলির ভাষাগত বিকৃতি ঘটে। এই কৃত্রিম ভাষাই পরবর্তীকালে 'ব্রজবুলি' ভাষা নামে পরিচিত হয়। সুতরাং ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম মিশ্র সাহিত্যিক ভাষা, যার মূল মৈথিলী। চৈতন্যের সমসময়ে বাংলাদেশে প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনা শুরু হয়। ব্রজবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ পদকার গোবিন্দ দাস। এই মধুর কৃত্রিম ভাষায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।

চৈতন্যোত্তর যুগের তিন প্রধান পদকর্তা বলরাম দাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজ।

বলরাম দাস

বলরাম দাস নামে একাধিক বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন। এঁদের মধ্যে ষোড়শ শতকে আবির্ভূত নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরের দোগাছিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়ভাষায় তিনি পদরচনা করেন, তবে তাঁর বাংলায় রচিত পদই যথার্থ কাব্যগুণান্বিত।

বাৎসল্য-ভাবের পদেই বলরামের সমধিক কৃতিত্ব। যশোদার কৃষ্ণের প্রতি স্নেহব্যাকুলতা এ-ধরনের পদের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর নবতৃণ-কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে।।

ইত্যাদি যশোদা-উপদেশে পুত্রের জন্য মাতার দুশ্চিন্তা ও স্নেহপরায়ণতারই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। বাৎসল্যভাবের অকৃত্রিমতা বলরামের ভাষার সরলতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

রাধার আক্ষেপানুরাগের পর ও চৈতন্য-নিত্যানন্দ বিষয়ে পদরচনাতেও বলরাম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর নীতি-উপদেশমূলক বৈরাগ্যের পদ তেমন প্রাণতা লাভ করেনি রবীন্দ্রনাথ বলরাম-রচিত পদের অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়', 'আমার হিয়ার ভিতর হৈতে তোমা কে কৈল বাহির' ইত্যাদি পদের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন তিনি।

অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে
চঞ্চল নয়নকোণে জাতিকুল নাশে।

বলরামের রূপানুরাগের পদের দৃষ্টান্ত। সহজ সরল অকৃত্রিম ভাষায় পদরচনায় বলরাম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের অন্যতম।

জ্ঞানদাস

বাংলা বৈষ্ণবপদসাহিত্যে চণ্ডীদাসের পরেই সমজাতীয় পদে জ্ঞানদাসের স্থান। কবিতার ভাব ও রূপবিচারে উভয়েই সমধর্মী। তাই জ্ঞানদাসকে বলা যায় চণ্ডীদাসের 'ভাবশিষ্য' অথবা উত্তরসাধক। বিদ্যাপতির অনুসরণে ব্রজবুলিতে পদরচনায় তিনি অনুকরণের সীমা উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কিন্তু চণ্ডীদাসের মতো সহজ ভাষায় ভাবগভীরতার প্রকাশে জ্ঞানদাসের স্বকীয়তা ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

কবিপরিচয়

ষোড়শ শতকে কাটোয়ার নিকটবর্তী কাঁদড়া গ্রামে কবির জন্ম। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী ও বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম নেত্রী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য। খেতুরির বৈষ্ণব মহোৎসবে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভণিতা যুক্ত পদসংখ্যা প্রায় চারশ'।

কবিপ্রতিভার পরিচয়

চৈতন্যোত্তর কালে জ্ঞানদাসের জন্ম। চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মের অনুরণন তাই তাঁর পদাবলীতে শ্রুত। এই ধর্মসচেতনতাতেই চণ্ডীদাস থেকে জ্ঞানদাস স্বতন্ত্র। নতুবা প্রেমব্যাকুলতা, প্রণয়-গভীরতা, বিরহের মর্মদাহ, পুনর্মিলনের আনন্দঘন প্রশান্তি—

এককথায় এগুলির নানা স্তর ও বৈচিত্র্যের প্রকাশে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস প্রায় অভিন্ন। উভয়ের পদের এই আত্মিক সাদৃশ্যে একই পদ উভয়ের নামে প্রচলিত হয়ে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

বৈষ্ণব পদাবলীর এই অনিন্দ্য রত্ন উভয়ের ভণিতাতেই লভ্য, কিন্তু কার রচনা সে সংশয়ের নিরসন আজও সম্ভব হয়নি। অবশ্য এ-ও সত্য যে, আবেগের দুরবগাহ গভীরতায় চণ্ডীদাসের কবিচেতনা অতলস্পর্শী, শিল্পমনস্কতা সত্ত্বেও জ্ঞানদাস তত বড় কবি নন। তাঁর স্থান চণ্ডীদাসের পাশে নয়, পরে।

পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মান, নিবেদন, মুরলীশিক্ষা, রসোদ্গার প্রভৃতি বিষয়ক পদে জ্ঞানদাসের স্মরণীয় অধিকার এবং তাঁর অবিস্মরণীয় পদগুলির অনেকগুলিই রসোদ্গার পর্যায়ের ঃ

১. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

২ গগনে ভুবনে দশ দিগ্‌গণে
তোমারে দেখিতে পাই।

আক্ষেপানুরাগ ও ভাবসম্মিলনের পদেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য ঃ

১. তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারি রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে॥

২. তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥

ইত্যাদি জ্ঞানদাসের পদাংশ সহজকথায় গভীর ভাব-প্রকাশে কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন।

গোবিন্দদাস

চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলায় রচিত বৈষ্ণবপদে জ্ঞানদাস যেমন দ্বিতীয়রহিত, ব্রজবুলিতে রচিত পদে গোবিন্দদাস তেমনি অদ্বিতীয়। জ্ঞান ও কবিপ্রতিভার

'যুগল সম্মিলন' তাঁর কবিতায়। বিদ্যাপতির একান্ত অনুগামী ও অনেকাংশে অনুরূপ' কবিকীর্তির অধিকারী বলে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' রূপেও তাঁর বিশিষ্ট পরিচিতি। বাংলায় রচিত পদে অবশ্য তাঁর প্রতিভা ম্লান।

কবিপরিচয় ঃ

গোবিন্দের পিতা চিরঞ্জীব সেন, মাতা সুনন্দা। পৈত্রিক নিবাস কুমারনগর। মাতামহ দামোদর সেন শ্রীখণ্ডের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃহারা গোবিন্দের বাল্যকাল কাটে শ্রীখণ্ডে। বৈষ্ণববিরোধী রক্ষণশীল সমাজের সংস্পর্শ এড়াতে পরিণত বয়সে কুমারনগরের বাস উঠিয়ে কবি চলে আসেন খেতুরির কাছে তেলিয়াবুধুরী গ্রামে। গোবিন্দের পত্নী মহামায়া, পুত্র দিব্যসিংহ। তিনি সপরিবারে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস তাঁর রচনা বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। গোবিন্দের কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে জন্মে কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর পদসংখ্যা প্রায় আটশ'। খেতুরির মহোৎসবে তিনি তাঁর রচিত পদের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

কবিপ্রতিভার পরিচয় ঃ

গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের মতো প্রাণের একতারাকে আশ্রয় করে কবিতানির্মাণ করেননি। তাঁর রচনা ভাষাভঙ্গিমা ও ছন্দের মূর্ছনার ঐকতান—প্রতিভা ও মনীষার সদ্ব্যবহারে এগুলির সঙ্গতবন্ধনে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পরেই বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাঁর স্থান।

গোবিন্দ রচিত পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ ব্রজবুলি ভাষার অপূর্ব মাধুর্য ; পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মাথুর ইত্যাদি বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী পারম্পর্য রক্ষা করে রাধাকৃষ্ণলীলার বিন্যাস-দক্ষতা এবং গৌরাঙ্গবিষয়ক অনন্য পদ। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কোনো বিশেষ পর্যায় বা পালা গাইতে হলে চৈতন্য বিষয়ক অনুরূপ ভাবের পদ প্রথমে গাওয়াই রীতি। এই পদকে বলে 'গৌরচন্দ্রিকা'। এ-জাতীয় পদরচনায় গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পালাকীর্তনের ক্ষেত্রে এই তিন কারণে গোবিন্দদাসের পদ গাওয়া প্রায় অপরিহার্য।

বহু বিচিত্র ভাবের পদ লিখে গোবিন্দদাস কীর্তিমান। তবে গৌরচন্দ্রিকা, রূপানুরাগ ও অভিসারের পদরচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব যেন একটু বেশি। অন্তর্নিহিত ভাব ও বহিরঙ্গ ভাষা অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করেছে এ-জাতীয় পদগুলিতে

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।

স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর-কিশোর।

গোবিন্দের এক অনন্য গৌরাঙ্গরূপ বর্ণনার নিদর্শন। অভিসারের পদেও এমনি ধ্বনিমাধুর্য ও কল্পনাকুশলতার পরিচয়ঃ

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।

গোবিন্দদাসের রূপানুরাগের পদে চিত্রিত রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতো অবোধ বালিকা নয়, অপরিণত বয়সেই পরিণত-মনস্কা। প্রেম যে যুক্তি মানে না, ধর্মভয়কেও তুচ্ছ করে সে-বিষয়ে সে-পূর্ণ সচেতনঃ

সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরমভয় লেশ।

গোবিন্দদাস সংস্কৃতজ্ঞ, অলংকারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি 'মঞ্জরী' সাধনায় অনুরক্ত ছিলেন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণসেবাকে জীবনে পরম কাম্য মনে করতেন কিন্তু তবু পদরচনাকালে কবি হিসেবে তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভাকে চূড়ান্ত প্রকাশ-অভিমুখী করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তি সযত্ন পরিচর্যায় যুগ্মভাবে কবিতার ফসল ফলিয়েছে। বস্তুত, বিদ্যাপতির মতোই ভাষার সুদৃঢ় ইমারত রচনা করেছেন গোবিন্দদাস, মধুনিষ্যন্দী ছন্দে যেখানে ভাবের অমরলোক প্রতিষ্ঠিত।

দশম অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মঠাকুর পুরুষদেবতা, তবে নিরাকার। শিলামূর্তিতে এবং বিভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন নামে ইনি পূজিত হন। এঁর পূজা পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনসা ও চণ্ডীর পূজা সারা বাংলায় এক সময়ে প্রসারিত থাকলেও তা ক্রমে লুপ্ত অথবা বিলুপ্তপ্রায়, গ্রামদেবী হিসাবে তাঁদের তেমন প্রভাব আর নাই। অন্যপক্ষে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে পূজিত ধর্মঠাকুরের প্রভাব আজও অম্লান। এখনও তাঁর উপাসনা ও পূজা হয়।

অস্ট্রিক 'দড়ম্' শব্দ থেকে (অর্থ কূর্ম) ধর্ম নামের উৎপত্তি অনুমান করেছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পণ্ডিতেরা, সুতরাং, আর্যেতর দেবতা হিসাবেই ধর্মঠাকুরকে গ্রহণ করেন। ডোম সমাজে এই পূজার বিশেষ প্রচলন আজও দেখা যায়। এই ঘটনা থেকেও বোঝা যায়, ধর্মঠাকুর আদিতে ছিলেন আর্যেতর দেবতা। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে তিনি এক মিশ্র দেবতা। প্রাগার্য, ইরাণীয়, আর্য, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান সব ধর্মের প্রভাব পড়েছে তাঁর বৈশিষ্ট্যকল্পনায়। তবে মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক নারায়ণের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

ধর্মমঙ্গলেরও দুটি কাহিনী। তবে লাউসেন-রঞ্জাবতী কাহিনীই বেশি জনপ্রিয়

কাহিনী ঃ

ধর্মঠাকুর চান মর্তে নিজ পূজা প্রচার। দেবসভায় ইন্দ্রের নর্তকী জাম্ববতীর তাল কেটে গেলে মর্তে জন্মাবার অভিশাপ পেল সে। ধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। রমতি নগরে বেণু রায়ের কন্যা রঞ্জাবতী হয়ে জন্মাল জাম্ববতী। তার দিদি গৌড়ের রাণী ; দাদা মহামদ, গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী।

গৌড়েশ্বর তখন ধর্মপালের পুত্র। তাঁর রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজিত। শুধু মন্ত্রী মহামদ স্বেচ্ছাচারী ও হঠকারী। তারই চক্রান্তে সম্ভ্রান্ত প্রজা সোম ঘোষ বন্দী। রাজা তাঁকে মুক্তি দিলেন, পাঠিয়ে দিলেন ত্রিষষ্ঠী বা ঢেকুর গড়ে সামন্তরাজ কর্ণসেনের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। কর্ণসেন রাজার দূর সম্পর্কীয় ভাই।

সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ। সে ক্রমে পরাক্রান্ত হয়ে উঠল। দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহ তার উপর। কর্ণ সেনকে তাড়িয়ে সে-ই হল গড়ের মালিক। গৌড়েশ্বরকে খাজনা দেওয়াও সে বন্ধ করল। ফলে গৌড়রাজের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে ইছাইর অসামান্য পরাক্রমে কর্ণ সেনের ছয় পুত্র নিহত হল। তাদের পত্নীরা হল সহমৃতা। কর্ণ সেন-পত্নীও শোকে আত্মঘাতিনী হলেন। কর্ণ সেনের দুঃখে কাতর গৌড়েশ্বর তাঁকে সংসারী করার জন্য তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিলেন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর। তাঁকে ময়না গড়ের রাজা করেও পাঠিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহে

সায় ছিল না মহামদের। রাজার প্রতি তার ক্রোধ সে প্রকাশ করল ভগিনীর উপর। তাকে প্রকাশ্যে বন্ধ্যা বলে গালি দিল। অপমানিতা রঞ্জাবতী পুত্রলাভে ধর্মের তুষ্টিবিধানে 'শালে ভর' অর্থাৎ কণ্টকশয্যা গ্রহণ করল। তার কৃচ্ছ্রসাধনায় তুষ্ট হয়ে ধর্ম তাকে পুত্র বর দান করলেন। এই পুত্রের নাম হল লাউসেন।

রঞ্জাবতীর পুত্রলাভে সকলেই খুশি, এক মহামদ বাদে। সে ঈর্ষার জ্বালায় লাউসেনকে চুরি করল; কিন্তু ধর্মঠাকুরের চেলা হনুমান অপহৃত শিশুকে উদ্ধার করে মায়ের কোল ভরাল।

ক্রমে লাউসেন অদ্বিতীয় বীর হয়ে উঠল। যেমন তার বীরত্ব, যেমনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। দেবী পার্বতী তার সংযম পরীক্ষা করে খুশি হয়ে তাকে দান করলেন আপনার অজেয় খড়্গ। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে এসে লাউসেন পড়ল মহাবিপদে। মহামদের চক্রান্তে সে নিক্ষিপ্ত হল গৌড়েশ্বরেরই কারাগারে। রাজা তার মন্ত্রবিদ্যার পরিচয় পেয়ে তাকে মুক্তি দিলেন আর তার পরিচয় পেয়ে প্রভূত সমাদর করলেন। ময়নাগড়ের তালুকও ইজারা দিলেন তাকে। বাড়ি ফেরার পথে লাউসেনের সঙ্গে পরিচয় হল কালু ডোমের। স্ত্রী ও অনুচরাদি সহ কালু ডোম চলল লাউসেনের সঙ্গে ময়না গড়ে। কালু হল লাউসেনের সেনাপতি।

ঈর্ষাকাতর মহামদ রাজাকে কুবুদ্ধি দিল লাউসেনকে পাঠিয়ে কামরূপের রাজাকে দমন করে রাজস্ব আদায় করতে। তার গোপন ইচ্ছা যুদ্ধে লাউসেন নিহত হোক। কিন্তু লাউসেন কামরূপরাজকে পরাজিত করল; লাভ করল রাজকন্যা কলিঙ্গাকে। সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া অপূর্ব সুন্দরী। গৌড়াধিপতি তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হলেন। তখন রাজা সিমুলা রাজ্য আক্রমণ করলেন। কানাড়া চণ্ডীর সেবিকা, দেবীর কাছ থেকে সে একটি লোহার গণ্ডার পেয়েছিল। সে ঘোষণা করল যে এক কোপে এই গণ্ডারের মাথা কাটতে পারবে তাকেই সে বিবাহ করবে। রাজা ব্যর্থ হলেন, কিন্তু লাউসেন সফল হয়ে বিয়ে করল কানাড়াকে। এতে রাজা একটু অসন্তুষ্ট হলেন তার উপর। এতকাল মহামদের লাউসেন-নিধনের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। এবার সে রাজাকে উত্তেজিত করল লাউসেনকে দিয়ে ইছাই ঘোষকে দমন করতে। অসীম পরাক্রমে চণ্ডীর সেবক ইছাই ও ধর্মঠাকুরের সেবক লাউসেন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। যুদ্ধে ইছাই দিল প্রাণ, বিজয়ী হল লাউসেন। মহামদ ধর্মঠাকুরের অসীম মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পুজোর আয়োজন করল। ধর্ম কিন্তু সে-পুজো গ্রহণ করলেন না। উপরন্তু, প্রবল বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিলেন গৌড়রাজ্য। আতঙ্কিত রাজা লাউসেনকে ডাকালেন। সে এসে প্লাবন বন্ধ করল।

লাউসেনকে কিছুতেই দমন করতে না পেরে মরীয়া হয়ে মহামদ রাজাকে প্রস্তাব দিল যে লাউসেন যদি প্রকৃতই ধর্মের সেবক হয়, ধর্মঠাকুরের কৃপায় সে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাক। রাজা চিরকালই মন্ত্রীর কুমন্ত্রণার দ্বারা চালিত। তিনিও লাউসেনকে

সে-আদেশ দিলেন। হাকন্দে দুশ্চর তপস্যায় লাউসেন নিমগ্ন। সেই সুযোগে মহামদ ময়না আক্রমণ করল। কিন্তু কানাড়ার বীরত্বে পরাজিত হল সে। এদিকে ধর্মঠাকুর কিছুতেই প্রসন্ন হচ্ছেন না দেখে লাউসেন নিজের মাথা কেটে যজ্ঞানলে নিক্ষেপ করল। ধর্ম আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর আদেশে অমবস্যার রাত্রিতে পশ্চিমে হল সূর্যোদয়। উপায়ান্তর না দেখে মহামদ এই দৃশ্যের সাক্ষী হরিহর বাইতিকে ঘুষ দিয়ে মিথ্যা কথা বলাতে চাইল। কিন্তু তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এত পাপের ফলে ধর্মঠাকুরের অভিশাপে তার দেহে কুষ্ঠরোগের সঞ্চার হল। লাউসেনের দয়ায় অবশ্য তার রোগমুক্তি ঘটল। লাউসেনের চেষ্টায় পৃথিবীতে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হল। পুত্র চিত্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে মাতাসহ লাউসেন ফিরে গেলেন স্বর্গে।

রূপরাম

কবিপরিচয়

রূপরাম চক্রবর্তী ছিলেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্বনামধন্য কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'অনাদ্যমঙ্গল'। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ধর্মঠাকুর কোথাও কোথাও 'অনাদ্য', 'নিরঞ্জন' ইত্যাদি নামেও পরিচিত। রূপরাম ষোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবত এই শতকের দ্বিতীয়ভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

রূপরামের কাব্যে আত্মপরিচয় আছে। বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুরে তাঁর জন্ম। ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতের পরিবারে জন্মালেও বাল্যে রূপরামের বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহ ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা সেজন্য তিনি ভর্ৎসিত হতেন। তারই পরিণামে তিনি গৃহত্যাগ করেন। অবশেষে গোপভূমের রাজা গণেশ কবিকে আশ্রয় দেন। একটি গানের দলও বেঁধে দেন। 'সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে' বলেছেন রূপরাম। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বৃত্তি সেকালে সমীচীন ছিল না। সম্ভবত সেইকারণে তিনি জাতিচ্যুতও হন।

কাব্যকথা

রূপরামের কাব্য সরল, প্রাঞ্জল। গুরুগৃহে পাঠ সমাপ্ত করতে না পারলেও তিনি যে কিছুটা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁর কাব্যে তার পরিচয় আছে ঃ

> কপালে সিন্দুর পরে তপন-উদয়।
> চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয় ।।
> চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
> ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ ।।

রূপরামই হয়ত প্রথম কবি যিনি লাউসেন কাহিনীকে 'ছড়া পাঁচালী ও ব্রতকথার সংকীর্ণ সীমা থেকে উদ্ধার করে মঙ্গল কাব্যের আকার দিয়েছেন।' দেবতার কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি মর্তসীমা অতিক্রম করেননি, বাস্তবতাকে স্থান দিয়েছেন কাব্যে, এ-ও তাঁর কৃতিত্ব। সহজ বর্ণনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। তাই যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্য বিশিষ্ট ও বিশেষ জনপ্রিয়। করুণ ও হাস্যরস পরিবেশনে তিনি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী কবিরা অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে রূপরামের কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে।

ঘনরাম

ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি এবং ১৭১১ খ্রীঃ তাঁর কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন।

কবিপরিচয়ঃ

ঘনরাম বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা সীতাদেবী। টোলে তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন এবং অল্পবয়সে কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন। কাব্যরচনায় তিনি সম্ভবত বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করলেও কবি ছিলেন রামভক্ত।

কাব্যকথাঃ

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল সুবৃৎ গ্রন্থ, চব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত দুটি কাহিনীকেই (হরিশ্চন্দ্র লুইচন্দ্রের কাহিনী ও লাউসেন কাহিনী) তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। প্রায় মহাকাব্যের আকারে রচিত হলেও মহাকবিসুলভ প্রতিভার অভাবে কবি পাঁচালীর আদর্শে কাব্যটি রচনা করেছেন।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ধর্মঠাকুরের কৃপায় সেবকের অসাধ্যসাধনের কাহিনী। যেহেতু সেবককে চাপে পড়ে বারবার অসম্ভব কর্ম করতে হয়েছে, সম্ভাব্যতার মাত্রাও কবিকে পার হতে হয়েছে বারবার। সুতরাং অবাস্তবতা ধর্মমঙ্গল কাহিনীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবু তারই অবকাশে সমাজ ও ইতিহাস ক্ষণে ক্ষণে এ' কাব্যে উঁকি দিয়েছে। রাঢ়ের সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস স্থান পেয়েছে ঘনরামের কাব্যে। কাব্যটি সেজন্যও মূল্যবান।

নগর পত্তনের ক্ষেত্রে ঘনরাম মুকুন্দরামের মতো সে যুগের জাতিবিন্যাসের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সে সময়ে মুর্শিদকুলি খান বাংলার দেওয়ান হয়ে ইজরাদার নিযুক্তির ব্যবস্থা করেন। ঘনরামের কাব্যে এই ইজারার উল্লেখ আছে। তাছাড়া সাধারণ

লোক এমনকি ক্ষমতাবান জমিদাররা যে রাজরোষে দুর্দশা ভোগ করত সে পরিচয়ও ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়ঃ 'মহতের দায় মিছা দিবে রায়।' ধর্মপালনের নামান্তরে তখন ব্যাভিচার স্থান পেয়েছিল সমাজেঃ

না বুঝয়ে তত্ত্ব পরদারে মত্ত
মজাইবে মাংস মদে।

ঘনরামের কাব্যে একটি স্মরণীয় মূল্যবান তথ্য সেকালের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে। যে-ক্রমটি সেকালে বিদ্যাভ্যাসে অনুসৃত হত তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর রচনায়ঃ

অ-কারাদি ক-কারান্ত জানা হইল স্বর।
ক-কারাদি ক্ষ-কারান্ত হল বর্ণাপর॥
অভিলাষে আংক অস্ক ফলাদি বানান।

তারপর,

অষ্টধাতু অষ্টসিদ্ধি সুবন্ত অমর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর॥
ধাতুনাম শব্দভেদ পড়িল অপর।

অবশেষে,

বেদবাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায়।

* * *

কাব্য অলংকার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম॥

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষর ও বানান, ব্যাকরণ-অঙ্ক, ধাতুরূপ, শব্দরূপ তারপর পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' পাঠের পর কাব্য-অলংকার ইত্যাদি শিক্ষা—একান্ত বাস্তব-নিষ্ঠা দিয়েই কবি এই পাঠক্রমের ক্রমটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। হয়ত ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছায়াতেই তা সম্ভব হয়েছে।

ঘনরাম নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কবিত্ব শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। অলংকার রচনাতেও কবি ছিলেন নিপুণ। ভারতচন্দ্রের মতো শব্দালংকারের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ ছিলঃ

বিপদ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুলকুল কুরব কমল কানে কান॥

ঘনরামের রুচি মার্জিত, গ্রাম্য-স্থূলতা থেকে প্রায় মুক্ত। তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা তীক্ষ্ম ছিল—ইতিহাস ও সামাজিক ঘটনার বর্ণনায় তার প্রমাণ। ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং

সরল সাবলীল গতিতে তাঁর বর্ণিত কাহিনী এগিয়ে গেছে। চরিত্রগুলি অংকনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও ঘনরামের চিত্রিত অপ্রধান চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত। বাঙালী নারীর যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে ভীরু বাঙালী একটু গৌরববোধই করতে পারে। ঘনরামের নারী চরিত্রগুলি নিজেরা শুধু বীরই নয়, সাহস ও প্রেরণার দাত্রীও বটে। কানাড়ার স্বজন হারানোর দুঃখে অশ্রুপাতে দুর্মুখা তাকে ধিক্কার দিয়ে জানিয়েছে :

শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে ॥

ঘনরাম হয়ত বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তবু তাঁর রচিত গ্রন্থ নানা উপাদানের গৌরবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

একাদশ অধ্যায়

মহাভারত

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানেচ কৌরবাঃ'—রাবণের দর্পের কারণে ধ্বংস হয়েছিল সোনার পুরী লঙ্কা; আর দুর্যোধনের দর্পের পরিণামে শতভ্রাতা ও অগণিত আত্মীয় বন্ধুসহ নিহত হয়েছিল সে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। প্রথম কাহিনী রামায়ণে বর্ণিত, দ্বিতীয়টি মহাভারতে।

মহাকাব্য মহাভারতের আদি কবি বেদব্যাস আট হাজার আটশ' শ্লোকে তাঁর অমর গ্রন্থ রচনা করেন। নানা কবির সংযোজনে তার বর্তমান শ্লোক সংখ্যা চব্বিশ হাজার।

মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় জীবনের কল্পনামিশ্রিত ইতিহাস। ভারতীয় জনজীবন, রাজারাজড়ার ইতিহাস, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, আচার-আচরণ, সমাজ পরিচয়ের আকর মহাভারত। মধ্যযুগে এই মহাগ্রন্থ প্রথম বাংলাভাষায় অনূদিত হয়। তবে সেকালে কোনো কবিই গ্রন্থটির আক্ষরিক অনুবাদে উৎসাহিত হননি।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি (লস্কর) পরাগল খাঁর সভাকবি ছিলেন। 'কবীন্দ্র' সম্ভবত তাঁর উপাধি। পরাগল চট্টগ্রাম জয় করেন ও সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী; তাছাড়া সমসাময়িককালে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধিতা স্তিমিত হয়ে একটি প্রীতির ভাব সমাজে সঞ্চারিত হয়েছিল। এই পরিবেশে মুসলমান শাসকেরাও কেউ কেউ হিন্দুর মহত্তম পুরাণগ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন।

পরাগল পরমেশ্বরকে এমনভাবে মহাভারতকথা অনুবাদ করতে বলেন যাতে মাত্র একদিনেই তিনি সমগ্র মহাভারত কাহিনীটি শুনতে পারেন। ফলত পরমেশ্বরের রচিত 'পাণ্ডব বিজয়' যা 'পরগলী মহাভারত' নামেও খ্যাত, মহাভারতের একটি অতি সংক্ষিপ্ত অনুবাদগ্রন্থ। তবে অতিসংক্ষিপ্ত সত্ত্বেও কবি প্রধান প্রায় সমস্ত ঘটনাকেই অনুবাদে স্থান দিয়েছেন। তত্ত্বকথায় মুসলমান শাসনকর্তার আসক্তি থাকবে না ধরে নিয়ে তিনি অবশ্য কাহিনী অংশেরই অনুবাদ করেছেন, তত্ত্বকথা সম্পূর্ণ অনুক্ত থেকেছে।

যতদূর জানা যায়, পরমেশ্বরই মহাভারতের প্রথম অনুবাদক। তিনি সম্ভবত ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর অনুবাদ সমাপ্ত করেন। প্রথম অনুবাদকের কৃতিত্ব ছাড়া পরমেশ্বর প্রাপ্য কোনো কবিত্বগৌরব আছে কিনা সন্দেহ। মহত্তম মহাকাব্য থেকে কবিপ্রেরণা লাভের পরিচয় রাখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সরল ভাষাভঙ্গিই তাঁর রচনার আশ্রয় ও বৈশিষ্ট্য।

পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন॥

তাঁর অনুবাদের আংশিক নমুনা।

শ্রীকর নন্দী

শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক। তিনি জৈমিনি-সংহিতা অবলম্বনে শুধু অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ তখন বাংলার সুলতান।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিও ছিলেন পিতার মতো বিদ্যানুরাগী ও হিন্দুপুরাণকথায় আগ্রহী। হিন্দুরাজাদের প্রাচীন ঐশ্বর্য ও যজ্ঞাদির বিষয়ে জানায় ছিল তাঁর একান্ত অনুরাগ। ফলত, তিনি তাঁর সভাকবি ও আশ্রিত শ্রীকর নন্দীকে শুধু অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদের নির্দেশ দেন। কবিও সে-আদেশ পালন করেন এবং সেইসঙ্গে ছুটি খাঁর কৃতিত্বকেও কাব্যে স্থান দেন। ছুটি খাঁর কীর্তি ত্রিপুরা রাজ্য জয়। এ-সম্পর্কে শ্রীকর নন্দী লিখেছেন:

ত্রিপুরা-নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ॥

সুতরাং তাঁর অনুবাদে শুধু পুরাণকথাই স্থান পায়নি, ইতিহাসের সংকেতও আছে।

শ্রীকর নন্দীর অনুবাদ পরমেশ্বরের অনুবাদ অপেক্ষা শ্রেয়, যদিও উৎকৃষ্ট কাব্য-গুণান্বিত নয়। হাস্যরসের প্রকাশে অবশ্য তাঁর কিছুটা দক্ষতা ছিল এবং সেইজন্য তাঁর কাব্য সুখপাঠ্য।

কাশীরাম দাস

বাংলাভাষায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস। তাঁর 'ভারত পাঁচালী' সপ্তদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রচিত হয়।

কবিপরিচয়

বর্ধমান জেলার সিঙ্গিগ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। তাঁদের কৌলিক পদবী দেব। কবি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর গুরু অভিরাম মুখোটির নির্দেশে কাব্যরচনায় ব্রতী হন। অবশ্য সমগ্র মহাভারত অনুবাদ কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। আদি, সভা, বনও বিরাট পর্বের কিছু অংশ রচনা করার পর কবির তিরোধান ঘটে

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

কবির ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও অন্য কবিরা ক্রমান্বয়ে অন্য পর্বগুলির অনুবাদ করে কাশীরামের আরব্ধ কাজের সম্পূর্ণতা দান করেন।

কাব্যকথা

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতোই কাশীদাসী মহাভারতের জনপ্রিয়তা। বাংলার ঘরে ঘরে এ-গ্রন্থ পঠিত হয়েছে, আজও তার জনপ্রিয়তা লুপ্ত হয়নি। বাঙালীর ধর্মচেতনা ও নীতিবোধ যে দুটি গ্রন্থ দ্বারা মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তার একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অপরটি কাশীদাসী মহাভারত। সামাজিক একতার ভিত্তিভূমি রূপেও গ্রন্থ দুটি মূল্যবান। সমবেত ধর্মচর্চা ও অবসর বিনোদনের মাধ্যম সঙ্গীত ও পাঁচালী গানের মুখ্য বিষয় ছিল রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী—গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও এ দুটি গ্রন্থ ছিল পরম আদরণীয়। নিত্য পাঠ্য গ্রন্থরূপে মধ্যযুগে গ্রন্হ দুটি সম্মান পেয়েছে। আজও সে সম্মান অম্লানধারায় প্রবাহিত।

বেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করেছেন কাশীরাম। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদে তৃপ্ত না হয়ে তিনি মূলত ভাবানুবাদেই মনোযোগী হয়েছেন। যে চারটি পর্ব কাশীরামের অনুবাদরূপে স্বীকৃত, তাতে দেখা যায়, কবি মূল কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, মাঝে দু-একটি স্বকৃত আখ্যান সন্নিবেশিতও করেছেন। কিন্তু এমন নিপুণ ভাষারীতি সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে যে সংক্ষিপ্ত আখ্যান যে মূল মহাভারতে নাই (যেমন শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান পারিজাত হরণ, সত্যভামার তুলাব্রত, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান) অনুধাবন করা যায় না। পূর্বাপর সঙ্গতি ও একই ভাষারীতি সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। অন্যপক্ষে, পরবর্তী অংশের ত্রুটি, নানা অসঙ্গতি, ভাষাগত দুর্বলতা, প্রমাণ করে যে, অপরের হস্তক্ষেপ সেখানে থাকা সম্ভব। নানা ভণিতা থেকে অবশ্য জানা যায় যে নানা কবির হস্তক্ষেপ এগ্রন্হে রয়েছে।

পাত্রপাত্রীর রূপবর্ণনাতে কবির অনুবাদ মূলানুগ। নীতি ও তত্ত্বকথার

অনুবাদেও কাশীরাম সাধ্যমতো মূলের অনুসরণ করেছেন। অথচ সে অনুবাদ সংস্কৃতগন্ধী না হয়ে হয়ে উঠেছে খাঁটি বাংলা ঃ

উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে।।
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরি রাজা-অগ্নি-চোর-বন্ধুগণ।।

এই অনুবাদে কাশীরাম অনুবাদরীতির একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন।

ভক্ত বংশে কাশীরামের জন্ম। বৈষ্ণব ধর্ম তখন বাংলাদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কবি নিজেও ছিলেন বৈষ্ণব। মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজবংশের কলহ ইত্যাদি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবির এই বৈষ্ণবভাব প্রকাশিত হয়েছে।

কাশীরাম অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত বাঙালীর কথা মনে রেখে কাব্যরচনায় ব্রতী হন। অনুবাদ যেক্ষেত্রে গুরুভার হওয়ার সম্ভাবনা, কবি অতি যত্নে সে অংশ অনুবাদ থেকে বিরত থেকেছেন। এইজন্যই ভীষ্ম পর্বের গীতা-অধ্যায়কে তিনি গ্রন্থে স্থান দেননি। তবে উপদেশাত্মক অংশগুলিকে লোকশিক্ষার অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে তিনি গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন ঃ

লুকাইয়া যেই জন করে পাপকর্ম।
লোকে তা না জানিলেও জানেন তা ধর্ম।।
চন্দ্র সূর্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম জানয়ে সকল।।

কাশীরাম নিজে ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ; তাছাড়া চৈতন্য পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তৎসম শব্দের আধিক্যও দেখা যায়। এই সকল কারণে কবির অনুবাদ তৎসম শব্দবাহুল্যে ও সমাস-সন্ধির জটাজালে কখনো কখনো কিছুটা সাবলীলতা হারিয়েছে। অন্যপক্ষে, চৈতন্যোত্তর ভক্তিভাবসিক্ত কবিমনের রচনা বলে মহাভারত-রূপ মহাকাব্যের অনুবাদে কবির ভক্তিমানসিকতা অকপটে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, ভাবানুবাদ হয়েও কাশীদাসী মহাভারত যথার্থ ধর্মগ্রন্থরূপে গৃহীত হতে পেরেছে। ভক্তি, নীতি ও ধর্মবোধের ভিত্তিরূপে কাশীদাসী মহাভারত পূজিত আর কবির প্রাঞ্জল, পরিচ্ছন্ন, ললিতভাষার জন্য গ্রন্থটি আদরণীয়। কবিকৃত মন্তব্যই তাঁর মহাভারত সম্পর্কে বাঙালীর মনের কথা ঃ

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

দ্বাদশ অধ্যায়

আরাকান রাজসভার কবি

আরাকান বাংলার পূর্বসীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের একটি বিভাগ। আরাকানের প্রজাও রাজারা জাতিতে মগ (বর্মী), ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। রাজ অমাত্যরা অনেকেই আবার জাতিতে মুসলমান। চট্টগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চল বলে এখানে বাংলা ভাষারও প্রসার ছিল। রাজা ও অমাত্যদের উৎসাহে মুসলমান কবিদের দ্বারা সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় বাংলাভাষায় কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যগুলিতে প্রচলিত হিন্দুধর্মীয় আখ্যানকে স্থান না দিয়ে ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ও লৌকিক প্রেমকাহিনীকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বাংলা ভাষায় লৌকিক প্রেমগাথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এঁদেরই দ্বারা। অবশ্য এগুলি ছিল অনুবাদ সাহিত্য।

ষোড়শ শতকে চট্টগ্রামের বিদ্যোৎসাহী শাসন কর্তারা (পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ) মহাভারত অনুবাদে উৎসাহ দিয়ে বাঙালীর একটি জাতীয় কাব্যরচনার পথ সৃষ্টি করেছিলেন, আর সপ্তদশ শতকে আরাকানরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হল বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রেম-আখ্যানের প্রথম কাব্য। দৈবীমহিমার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে মানবপ্রেম ফল্গুধারার মতো সংগুপ্ত ছিল, কবি দৌলত কাজীর চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে তা এক স্বতন্ত্র অধিকার স্থাপন করল।

দৌলত কাজী

কবিপরিচয়

দৌলত কাজী রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্যের নাম 'লোর চন্দ্রানী' বা 'সতীময়না।' কাব্যটির আখ্যান মৌলিক নয়, মিয়া সাধনের হিন্দী কাব্য 'মৈনা কো সত্' থেকেই কাহিনীটির উপাদান গৃহীত। আরাকানের সমরসচিব আশরাফ খানের আগ্রহ ও উৎসাহে ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে কাব্যটি রচিত হয়।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে দৌলত কাজীর জন্ম। অল্পবয়সেই তিনি নানা বিদ্যার অধিকারী হন। আরাকানরাজ থিরি-থু-ধম্মা অর্থাৎ শ্রীধর্মার তিনি ছিলেন রাজসভাকবি। দৌলত কাজী তাঁর কাব্যটি সম্পূর্ণ রচনা করতে পারেননি, দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৬৫৯ খ্রীঃ আরাকানরাজ সান্দ-থু-ধম্মা অর্থাৎ চন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি আলাওল কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

অঞ্চলভেদে কাব্যটির আখ্যানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও মূল কাহিনীটি মোটামুটি এক।

কাব্যকথা

গোহারী দেশের রাজা মোহরার পরমাসুন্দরী কন্যা চন্দ্রানীর স্বামী ছিলেন বামন। মহাবীর লোরক ও চন্দ্রানী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই প্রেমের পরিণামে লোরক তাঁর প্রথমা পত্নী সতী ময়নামতীকে ত্যাগ করে চন্দ্রানীকে সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করেন ও তাঁকে বিবাহ করেন। বিরহের দুঃখে কাটে সতী ময়নার কাল। কাহিনীর এ পর্যন্ত দৌলত কাজীর রচনা। পরবর্তী অংশ সৈয়দ আলাওলের। ময়নার বিরহকাতরতা দূর করতে তাঁর এক সখী একটি গল্প রচনা করেন; ধর্মবতীর রাজা উপেন্দ্রদেব তাঁর অন্তঃসত্ত্বা পত্নী রতনকলিকাকে ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে রতনকলিকার একটি পুত্র জন্মে। তার নাম আনন্দ। আনন্দ বড় হয়ে বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে উপেন্দ্রদেবের নিকট উপস্থিত হন। তাঁরই চেষ্টায় স্বামীর সঙ্গে রতনকলিকার মিলন ঘটে। এই কাহিনী শুনে সতী ময়নার বিরহশোক দ্বিগুণিত হয়। তিনি এক ব্রাহ্মণকে লোরকের কাছে দূত হিসাবে পাঠান। লোরক চন্দ্রানীসহ সতী ময়নার কাছে ফিরে আসেন। দুই সতীনে মিলে পরমানন্দে পতিসেবা করতে থাকেন। সুখে কাটে তাঁদের কাল।

দৌলত কাজী অপেক্ষা আলাওল বড় কবিরূপে খ্যাত। কিন্তু 'লোর চন্দ্রানী'র উপাখ্যানে ময়নার সতীত্ব, সর্বপ্রলোভন জয়, পলাতক স্বামীর প্রতি ময়নার শ্রদ্ধা ও প্রেমে অবিচল নিষ্ঠা সর্বোপরি চন্দ্রানীর প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রেমের নানা রহস্য প্রকাশ দৌলত কাজী যত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন, আলাওল তা পারেননি। দৌলত কাজীর মতো আন্তরিকতা না থাকাতেই বোধ হয় তা সম্ভব হয়নি। দৌলত কাজী সংস্কৃত পুরাণ ও ইতিহাসে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল, মার্জিত, ছন্দও নিখুঁত। দৌলত কাজীর কবিপ্রতিভার ভাস্বর স্বাক্ষর 'লোর চন্দ্রানী' কাব্য।

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্য হিন্দুদেবদেবীর লীলা-আখ্যানে পূর্ণ থাকায় মুসলমান সমাজের কাছে তা সাধারণভাবে পরম আদরে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি। সে-অভাব পূর্ণ হয়েছিল 'লোর চন্দ্রানীর' মতো কাব্যের দ্বারা। অন্যপক্ষে, এই মানবিক প্রেম-আখ্যানে দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য না থাকায় কাব্যিক উৎকর্ষ সত্ত্বেও হিন্দু-সমাজে লোরচন্দ্রানী বিশেষ পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। তবু, স্বামী পরিত্যক্ত রতনকলিকাকে ব্রাহ্মণের আশ্রয় দান, সতী ময়নার ব্রাহ্মণকে স্বামীর কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ধর্মীয় সম্প্রীতির আভাস পাওয়া যায় তার মূল্যও কম নয়। সর্বোপরি, 'লোর চন্দ্রানীর' মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন ধারার সূচনা হয়েছিল, এজন্যও কাব্যটি চিরস্মরণীয়।

আলাওল

মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের সর্বাধিক পরিচিত মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল। তাঁর কাব্য সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের

কাছেই সমাদৃত হয়েছিল। মৌলিক রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেননি, মহৎ কবি-প্রতিভারও সাক্ষ্য রাখতে পারেননি ; তবু রচনার ব্যাপকতায় তাঁর খ্যাতি অম্লান হয়ে বিরাজ করছে।

কবিপরিচয় ঃ

সৈয়দ আলাওলের পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য। ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে ও সৌভাগ্যের সন্ধানে তিনি বঙ্গদেশে আসেন। কবি চট্টগ্রামে (মতান্তরে ফরিদপুরে) ষোড়শ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৭৩ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। পিতৃহীন কবি প্রথম জীবনে মগরাজের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীত পারদর্শিতার জন্য তিনি আরাকানের অভিজাত মুসলমান সমাজে পরিচিত হন এবং তাঁদেরই উৎসাহে ও আনুকূল্যে আরবী, ফারসী ও হিন্দী কাব্য ও গ্রন্থ অনুবাদে মনোযোগী হন। তাঁর উৎসাহদাতাদের মধ্যে ছিলেন আরাকান রাজ চন্দ্রসুধর্মা প্রধানমন্ত্রী মগনঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, প্রথিতযশা পণ্ডিত সৈয়দ মুসা প্রমুখ।

কাব্যকথা ঃ

তাঁর রচনাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ১. আরবী ফারসী থেকে অনূদিত ঐশ্লামিক ধর্মতত্ত্ব ও কাহিনী। মুসলমান সমাজে এগুলি যথেষ্ট সমাদৃত হলেও হিন্দুসমাজে অজ্ঞাত থেকে গেছে। 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল', 'সপ্ত পয়কর', 'তোহফা', 'সেকেন্দার নামা' এই শ্রেণীতে পড়ে। ২. হিন্দী থেকে অনূদিত কাব্য। সম্প্রদায়নির্বিশেষে বাঙালীর কাছে ছিল এর আবেদন ও পরিচিতি। মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচিত 'পদ্মাবতী' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

চিতোরের রাণী পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ কাহিনী সর্বজনশ্রুত। এই কাহিনীর সুলতানের চিতোর আক্রমণ-অংশ ঐতিহাসিক। কিন্তু কারণস্বরূপ বলা হয়েছে সুলতানের রূপলোলুপতা। তিনি নাকি পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চিতোর আক্রমণ করেন। এ-ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য নয়। এই কাল্পনিক অংশের প্রতিই গুরুত্ব দিয়ে রচিত হয়েছে জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য (১৫৪০ খ্রীঃ) তথা আলাওলের 'পদ্মাবতী' (সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ),। সুতরাং উভয় কাহিনীতেই রোম্যাণ্টিক প্রেমের প্রাধান্য। কিন্তু আলাওল জায়সীকে পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি, স্বকৃত কিছু ঘটনাকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন ; শেষাংশে পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। বাংলার সমাজ ও পরিবেশের প্রভাবও তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। দু-একটি চরিত্রের বিন্যাসের ক্ষেত্রেও উভয় কাব্যে পার্থক্য আছে। তাছাড়া জায়সী সুফী সাধনার জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসাবেই কাহিনীটি

পরিবেশন করেছেন, আলাওল সুফী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমকাহিনীরূপে কাহিনীটি উপস্থিত করেছেন।

'পদ্মাবতী'র জন্যই সৈয়দ আলাওলের বিশেষ খ্যাতি অথচ খ্যাতি অনুযায়ী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি কবি। যে আন্তরিকতা ও গভীরতা দৌলত কাজীর রচনায় পাওয়া যায় 'পদ্মাবতী'তে তারও অভাব। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে আলাওল দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশ রচনা করেন। সেখানেও উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে দৌলত কাজীর রচনাই অধিক কবিত্বগুণ সমৃদ্ধ। অবশ্য আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা সতী ময়নার অংশ নয়, 'পদ্মাবতী' কাব্য। এবং কবিত্ব শক্তিতে যাই হোক, পয়ার-ত্রিপদী রচনার নিপুণতায় তিনি সেখানে তাঁর কবিত্ব-দক্ষতা প্রমাণ করেছেন।

'পদ্মাবতী'র কাহিনীর আবেদন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালীর হৃদয়ই আলোড়িত করেছিল। সেজন্য তিনি খ্যাতকীর্তি। কিন্তু আরও একটি কারণে বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। চিতোরের রানা রত্নসিংহ এবং সুলতান আলাউদ্দিন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সুলতান কর্তৃক চিতোর আক্রমণও ঐতিহাসিক ঘটনা। 'পদ্মাবতী'তে ইতিহাস ক্ষীণভাবে ব্যবহৃত হলেও বলা যায় বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্যরচনার সূচনা করেন কবি সৈয়দ আলাওল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কবি ভারতচন্দ্র

দেব-দেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনই ছিল প্রাক্‌-অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য। লোকজীবন সেখানে গৌণ। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' প্রথানুগতিক মঙ্গলকাব্যধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সমাজজীবনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল। স্বপ্নাদেশ ও ধর্মীয় প্রেরণা ছিল পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যরচনার মুখ্য কারণ। আশ্রয়দাতার অনুরোধ অবশ্য কখনো কখনো উৎসাহ জুগিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনায় দৈবীপ্রেরণা বিন্দুমাত্র ছিল না। আশ্রয়দাতার অনুরোধ এবং কবিত্বশক্তি প্রকাশের ব্যক্তিগত বাসনাই তাঁকে লেখনী ধারণে প্রেরণা জুগিয়েছে। স্বভাবতই, 'অন্নদামঙ্গলে' দৈবীমহিমা মর্তসীমায় আবদ্ধ হয়ে গেছে, দেবকাহিনীর নামান্তরে লোকজীবন কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে:

মধ্যযুগীয় চেতনার অবসান ও আধুনিক মানসিকতার সূচনার কবি ভারতচন্দ্র। তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি ছিলেন এবং এই শতকীয় বাঙালী মানসিকতা ও সমাজজীবন তাঁর রচনাতেই সর্বাধিক পরিস্ফুট।

কবিপরিচয়

বর্ধমানের অন্তর্গত ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে কবির জন্ম হয়। ধনাঢ্য পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের তিনি চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র। বর্ধমান রাজার রোষে নরেন্দ্রনারায়ণ সর্বস্বান্ত হন। ভারতচন্দ্র গাজিপুরের কাছে নওয়াপাড়ায় মাতুলালয়ে বিদ্যাভাস শুরু করেন। সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হওয়ার কালেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তিনি বিবাহ করেন ও সকলের বিরাগভাজন হন। অভিমানে গৃহত্যাগ করে তিনি রামচন্দ্র মুনশির আশ্রয়ে ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। এখানেই তাঁর কবিত্বশক্তির প্রথম প্রকাশ। অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তির ব্যাপারে সুবিচারের আশায় বর্ধমানরাজের দরবারে গিয়ে কর্মচারীর চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে পালিয়ে তিনি যান পুরীধামে। বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠের সুযোগ আসে সেখানে। তারপর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশে বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে বাংলাদেশে এসে আত্মীয়দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কবি সংসারাশ্রমে ফিরে আসেন। ফরাস-ডাঙায় ফরাসীদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আনুকূল্যে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে

পরিচিত হন এবং মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তিতে মহারাজের সভাকবির পদ পান। মহারাজের নির্দেশেই রচিত হয় তাঁর অমর কাব্য 'অন্নদা মঙ্গল।' কবির ইচ্ছানুযায়ী কৃষ্ণচন্দ্র বার্ষিক ছশ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে মূলাজোড় অঞ্চল তাঁকে পত্তনি দেন। তাঁর মূলাজোড় বাস সুখের হয়নি। ১৭৬০ খ্রীঃ, তিনি পরলোক গমন করেন।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভারতচন্দ্র বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ধনীর দুলাল দুর্ভাগ্যের দ্বারে বারবার দুঃখভিক্ষা লাভ করেছেন কিন্তু নীলকণ্ঠের মতো সমস্ত দুঃখ আপনার অন্তরে সঞ্চিত রেখে পাঠককে উপহার দিয়েছেন তীক্ষ্ন সরস ব্যঙ্গ ও হাস্যরস। বিড়ম্বিত জীবনে অনেক ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু যেখানেই গেছেন সেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন বিদ্যাসম্পদ। আপন অধ্যয়ন-পরিধি সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়েছেন

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলংকার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
পুরাণ আগম বেত্তা নাগরী ফারসী।

বিদ্যার এই সর্বব্যাপকতার গুণে ভারতচন্দ্রের ভাষা শাণিত, শব্দসম্পদে গরীয়ান। শব্দসীমিতির কল্যাণে তাঁর অনেক কথা তো আজ প্রবাদবাক্য। 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ', 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর', 'মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়', 'এক ভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ইত্যাদি উদ্ধৃতিগুলি তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত বলে শুধু সত্য নয়, মিতভাষিত হওয়ায় হৃদয়গ্রাহী।

কাব্যকথা

ভারতচন্দ্র সর্বশেষ মঙ্গলকাব্য রচয়িতা। সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার অধিকার মুকুন্দ-রামেরই প্রাপ্য। তবে মণ্ডনকলা, অলংকরণ নিপুণতা, ভাষাবিন্যাস ও ছন্দকুশলতায় নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। বিদগ্ধ কবি দরবারে বসে বিলাসী রাজার মনোরঞ্জনে কাব্য রচনা করেছেন একথা ভারতচন্দ্র কখনো ভুলতে পারেননি। সুতরাং তাঁর কবিচেতনা মগ্ন থেকেছে বিশ্বকর্মাবৃত্তিতে, কবিতার গভীরে প্রাণসঞ্চারে ততটা নয়। রূপদক্ষতায় তিনি অনন্য, জয়দেবের সঙ্গেই তুলনীয়। অন্নদামঙ্গল তাঁর কবিকৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তিনটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী নিয়ে কাব্যটি রচিত ঃ 'অন্নদামঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'মানসিংহ' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'।

মঙ্গলকাব্যধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 'অন্নদামঙ্গল' রচিত। তবু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু হয়েছে এ মঙ্গলকাব্য। আলিবর্দির দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগারে

নিক্ষেপের প্রসঙ্গে তৎকালীন বাস্তব ঘটনার কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। তারপর উমার জন্ম, শিবের সঙ্গে বিবাহ, কুবেরের অনুচরের হরি হোড় নাম নিয়ে মর্তে জন্ম, দেবীর কৃপায় হরি হোড়ের ধনলাভ, কুবেরপুত্র নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার নামে মর্তে (কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) আগমন ও দেবীর ভবানন্দ ভবনে যাত্রা 'অন্নদামঙ্গল' অংশে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অংশের সূচনাও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বহন করে। বাংলার বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমন ঐতিহাসিক ঘটনা। তারপরই বিদ্যা ও সুন্দরের কাল্পনিক প্রণয় কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত। 'অন্নদামঙ্গলে' সুরুচির অভাবের অভিযোগ এই কাহিনীটিকে কেন্দ্র করেই দেখা দিয়েছে। তৃতীয় খন্ড 'মানসিংহ' কাহিনীতে অন্নপূর্ণার কৃপায় ভবানন্দের ঐশ্বর্যলাভের কাহিনী বর্ণিত। ইতিহাসের ইঙ্গিত এখানেও বর্তমান, তবে তা বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত।

মঙ্গলকাব্য প্রধানত গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবিতেই সমৃদ্ধ। কিন্তু ভারতচন্দ্র তাতে প্রবাহিত করলেন নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্যপূর্ণ আবিল স্রোত। ভারতচন্দ্রের প্রশংসা-নিন্দা সবকিছুই এই বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে। ভারতচন্দ্রের সমলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর কথাই কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে অনেক সমালোচকের ভাষায় —'Knowledge এবং art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল' এবং 'পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র।' অবশ্য 'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র 'নটবিট' অপেক্ষা 'সরস্বতীর বরপুত্র' রূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বেশি। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনীর প্রথাগত বিবরণের মধ্যে ভারতচন্দ্র নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন —তৎকালীন নাগরিক জীবন ও ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করায় ইতিহাস মঙ্গলকাব্যে তথা বাংলাসাহিত্যে প্রত্যক্ষত প্রবেশ লাভ করল প্রথম তাঁর কাব্যে।

ইতিহাসের ইঙ্গিতদান ও নাগরিক বিলাস বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ভারতচন্দ্র নিরন্নের কন্ঠধ্বনিকে রূপ দিয়েছেন অপূর্ব চাতুর্যে। কখনো বা ব্যঙ্গ পরিহাসে

ঘরে নাহি অন্ন যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাদ।

কখনো পাত্রপাত্রীর একান্ত কামনায় প্রতিফলিত হয়েছে দারিদ্র্যনিষ্পিষ্ট বাঙালীর বাসনা —'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' তখন কবি আর কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি মাত্র থাকেন না, হয়ে ওঠেন সমগ্র বাঙালীজাতির কবি। শব্দ-ছন্দ-অলংকারসম্পদে

'ভারত ভারতখ্যাত'। তবে সমকালীন শব্দালংকারপ্রীতির প্রচলিত বিধিকে কবিও অতিক্রম করতে পারেননি, বরং একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন ঃ

বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

তাতে তাঁর খ্যাতি বেড়েছে, কিন্তু কবিত্বশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের সমাজ ও অন্নদামঙ্গলে চিত্রিত সমাজ

অষ্টাদশ শতকে গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালী জীবন নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এতাবৎ নগর ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম, তার সঙ্গে গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের নিবিড় সংযোগ ছিল। এই সংযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হল অষ্টাদশ শতকে।

নাগরিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য মোগল সম্রাটদের অনুকরণে বিলাস-ব্যসন। মুসলমান শাসকেরাই শুধু তার দ্বারা প্রভাবিত হননি, হিন্দু ধনীদের মধ্যেও এ রোগ সংক্রামিত হয়েছিল। কারণ, তা-ই ছিল সেযুগে আভিজাত্যের লক্ষণ। মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব আদায়ের নতুন পদ্ধতিতে পুরনো জমিদাররা আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হল, তাদের স্থান দখল করল, ইজারাদাররা—যারাই আবার পরবর্তীকালে হয়ে গেল জমিদার। এই 'হঠাৎ নবাবের' দল সংস্কৃতি চর্চা অপেক্ষা ধনার্জনে পটু, ঐতিহ্যহীন বলে অনুকরণে আগ্রহী। স্বভাবত, শাসককুলের জীবনযাপনরীতির অনুকরণ হল তাদের স্বভাব। নগরজীবনে বিলাস আর গ্রামীণ জীবনে দারিদ্র্য এটাই অষ্টাদশ শতকে বাংলার সামাজিক চিত্র।

সুখ বা শৃঙ্খলা নগরজীবনেও ছিল না। বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে রাজরোষে জমিদার বা ধনী আকস্মিক ভাবে হয়েছে নিঃস্ব। ভারতচন্দ্রের পিতা বর্ধমানের রাজার উদ্দেশে কটূক্তি করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, কবি নিজেও বিনাকারণে রাজকারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

সমাজজীবনে অস্থিরতা ছিল আরও একটি কারণে—বর্গির আক্রমণ। ১৭৪২-৫১ এই দশ বছর ধরে বাংলাদেশকে তারা শোষণ করেছে, নিপীড়ন চালিয়েছে সার্বিক-ভাবে। ধনী ও নির্ধন উভয়েই তাদের শিকার হয়েছে—সমাজজীবন হয়ে গেছে বিপর্যস্ত।

এই সামাজিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। গ্রাম জীবনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তার ফলভোগ করতে হয়েছে বাঙালী-মাত্রকেই। রাজনীতি ও রণনীতি উভয় ক্ষেত্রে সুদক্ষ আলিবর্দি খাঁকে মারাঠা ও আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে যেমন রোজকোষে

টান পড়ে, তেমনি সন্ধির শর্ত পালন করতেও অনেক ব্যয় হয়। (মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে ১৭৪৩ খ্রীঃ এককালীন বাইশ লক্ষ টাকা দিতে হয় এবং ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ থেকে বার্ষিক দেয় হয় বার লক্ষ টাকা)। রাজ কোষাগারের অবস্থা তাতে শোচনীয় হয়। ব্যক্তিগত সম্পদ লুণ্ঠন করেও বাঙালীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে দুরবস্থায় পরিণত করেছিল বর্গীরা। এদিকে এই সামাজিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বাঙালীজীবন যখন বিপন্ন, দেশে শস্য-উৎপাদনের দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধির চেষ্টাও ব্যাহত হয়।

বাঙালীর অর্থ অষ্টাদশ শতকে শুধু বাংলার বাইরেই যায় নি, বিদেশী বণিকদের দ্বারা ভারতের বাইরেও গেছে। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে কলকাতা ছিল পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং অর্থবান ও ব্যবসায়ী বাঙালীরা প্রাণ ও সম্পদ রক্ষায় কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল। তার ফলে শুধু কলকাতা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে নি ইংরেজদের ব্যবসাও জমে উঠেছিল আশাতীতভাবে। সেই সূত্রে মুষ্টিমেয় বাঙালী ব্যবসায়ীরও অর্থাগমের দ্বার খুলে গিয়েছিল।

সামাজিক সার্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বাঙালীর নৈতিক জীবন এই সময়ে দ্রুত নিম্নমুখী হয়। রাজকুলে ষড়যন্ত্র ও হঠকারিতা তো ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। রাজকর্মচারী আলিবর্দি নবাব সরফরাজকে যুদ্ধে নিহত করে মসনদ অধিকার করেন, ভাস্করপণ্ডিতকে ছলনাদ্বারা বধ করেন; আপন সেনাপতি আফগান প্রধান গোলাম মোস্তাফাকে প্রবঞ্চিত করেন। আবার তাঁর রণদক্ষ সেনাপতি মীর হাবিব আলিবর্দির সঙ্গেই হঠকারিতা করেন। প্রকৃতপক্ষে মীর হাবিবের আলিবর্দি-বৈরিতা ও বর্গীদের সহযোগিতার কারণেই বর্গী লুণ্ঠন বাংলাদেশে এতকাল স্থায়ী হতে পেরেছিল। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) সিরাজের পরাজয় তো ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতারই পরিণতি। মীরজাফর একাই একাজে লিপ্ত ছিলেন না। বরং বলা যায়, লিপ্ত ছিল না এমন উচ্চ রাজকর্মচারীই সম্ভবত ছিল না।

সুজাউদ্দিন, সরফরাজ ও সিরাজ সকলেই ছিলেন চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী। নবাবকুলের এই বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে, অভিজাত বাঙালী মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইসঙ্গে হিন্দুদের ধর্মের প্রতি উদাসীনতা এবং বালবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক ত্রুটি অষ্টাদশ শতকের বাঙালী জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

ভারতচন্দ্র (১৭১২-৬০) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে জন্মান। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাকে কখনো সোজাসুজি, কখনো একটু বঙ্কিমভাবে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তবে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন। ফলত, সমাজচিত্রণ সেখানে কবির প্রাথমিক উদ্দেশ্যও নয়, এমনকি প্রয়োজনীয় গুরুত্বও পায়নি। তবু বিক্ষিপ্তভাবে তিনিও তৎকালীন সমাজের কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

আলিবর্দি কর্তৃক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করা, জাহাঙ্গীরের প্রতাপাদিত্য তথা বারভূঁইঞা দমনে মানসিংহকে বাংলায় প্রেরণ ইতিহাসেরই অনুসরণ। বালবিবাহ ও বহু বিবাহের পরিণতিকে রূপ দিতে গিয়ে বাস্তবতাই স্থান পেয়েছে জামাতার বর্ণনা প্রসঙ্গেঃ

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।

এছাড়াও আছে নানা প্রসঙ্গঃ

বর্গী হাঙ্গামার প্রসঙ্গঃ	লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল। গঙ্গা পার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল॥
বহুবিবাহ প্রসঙ্গঃ	এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর। দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥
কৌলীন্য প্রথাঃ	যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।
বৃদ্ধ স্বামী ও তার নৈতিক শৈথিল্যঃ	অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
তৎকালীন বাণিজ্যে উন্নতি ও রাজসেবায় অনিশ্চিত অবস্থাঃ	বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্ধেক চাষ রাজসেবা কত খচমচ।

ভারতচন্দ্র সমসাময়িক সমাজচিত্রণে বেশি গুরুত্ব দেননি, তবু তাঁর অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং কবিপ্রতিভা স্বল্পায়াসে স্বল্প পরিসরেই তৎকালীন সমাজের প্রধান লক্ষণগুলিকে অমর তুলিকায় চিত্রিত করেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

শাক্ত পদাবলী

সৃষ্টির অন্তরালে বিরাজিতা সর্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তি। তিনি ভীষণা, ভয়ংকরী; আবার মাতৃরূপিণী; মঙ্গল ও কল্যাণময়ী। বাঙালীর কাছে তিনি দ্বিরূপেই পরিচিতা। মূলত তিনি শক্তি—শিবশক্তি, শিবপত্নী। কখনো তাঁর রূপ কালী বা শ্যামা, কখনো গৌরী বা উমা। শ্যামারূপে তিনি জগজ্জননী, উমারূপে হিমালয়-তনয়া ও শিবজায়া। আদ্যাশক্তির শ্যামা ও উমারূপকে অবলম্বন করে অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবপদাবলীর অনুসরণে যে ক্ষুদ্র অথচ অপূর্ব সঙ্গীতগুলি রচিত হয়েছিল তারই সাধারণ পরিচয় শাক্তপদাবলী। শক্তি থেকেই শাক্ত শব্দের উৎপত্তি।

নারী ত্রিরূপা ঃ কন্যা, প্রেয়সী, জননী। রাধাকে কৃষ্ণের প্রেয়সীরূপে কল্পনা করে রচিত হয়েছিল বৈষ্ণব প্রেমসঙ্গীত। হিন্দুসমাজের অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণী-বিভাগ, অন্ত্যজ শ্রেণীর অভিমান ও উচ্চবর্ণের অহংকার এবং হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক অসদ্ভাবে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে প্রেমধর্ম তথা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বাঙালীকে প্রেমধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। আর অষ্টাদশ শাসকের অপশাসন, অভিজাত বাঙালীর বিলাসব্যসন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনিশ্চয়তা দুঃসহ ভীরুতায় বাঙালীজীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। তাতে কাঙ্ক্ষিত হয়েছিল এক বরাভয়প্রদা দেবীর—শক্তি ও কল্যাণের প্রতীকরূপে যিনি এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বাঙালীকে উদ্ধার করবেন। সে শক্তিই কালী। তাঁরই পরিচয়, মাহাত্ম্যবর্ণনা ও আরাধনা শাক্তসঙ্গীতে।

তন্ত্রোক্ত কালী অষ্টাদশ শতকের সৃষ্টি নয়। আবহমানকাল তিনি একটি গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিতা। আদ্যাশক্তির উল্লেখ ঋগ্‌বেদের সূক্তেও পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ইনি চণ্ডী নামে পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না হয়ে যান। পৌরাণিক ও লৌকিক চণ্ডীর অভিন্নরূপ মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে। সুতরাং এক অর্থে চণ্ডীমাহাত্ম্যও শাক্তসাহিত্য। কিন্তু শাক্তপদাবলী বলতে বোঝায় বৈষ্ণব পদাবলীর আকারে রচিত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গীত, যাতে শাক্তসাধকের নিগূঢ় অনুভূতি ও সাধনপ্রক্রিয়া রূপায়িত। শাক্তসাহিত্য মূলত ধর্মসঙ্গীত।

শাক্তসঙ্গীতের দুটি ধারা—একটির মধ্যদিয়ে মাতৃরূপিণী শ্যামার প্রকাশ (শ্যামা-সঙ্গীত) অন্যটি কন্যারূপা উমা-বিষয়ক। একটিতে ভক্তিরসের প্রাধান্য, অন্যটিতে বাৎসল্যরস মূর্ত। একটিতে সাধনতত্ত্বের কথা, অন্যটিতে বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবন। একটির সাধারণ পরিচয় শ্যামাসঙ্গীত, অন্যটির আগমনী-বিজয়া গান বা উমাসংগীত।

অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, অমিতাচার, অরাজকতা ও নিঃস্বতার ইতিহাস। আলিবর্দি সুশাসক হয়েও বিশ্বাসঘাতক। সরফরাজ খাঁর কর্মচারী হয়েও তাঁকে নিহত করে তিনি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। মারাঠা সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধির শর্তভঙ্গ করে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ লুণ্ঠন করেন। আর সিরাজের পরাজয়ের মূলে তো আমীর-ওমরাহদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা—মীরজাফর তো তাদের প্রতিনিধি। অন্যেরাও সম-অপরাধে অপরাধী। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ এই প্রায় দশ বছর ধরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে বর্গী অর্থাৎ মারাঠা সেনার বর্বর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঝড়। আলিবর্দি রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ সন্ধির শর্ত অনুসারে দিয়েও বাংলাদেশকে তাদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেননি। পরবছরই দ্বিগুণ উৎসাহে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চলেছিল তাদের বীভৎস অত্যাচার। এছাড়া তৎকালীন প্রায় সমস্ত শাসকরাই অত্যাচার ও অর্থলোলুপতার কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করে গেছেন। আলিবর্দির জামাতা সুজাউদ্দিন, তাঁর পুত্র সরফরাজ এবং সিরাজ (আলিবর্দির দৌহিত্র) বাংলার মসনদে বসে বিলাসব্যাসনেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অমিতাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। দেশব্যাপী অনিশ্চয়তার সুযোগও নিয়েছিল স্বার্থপরের দল। বিলাসী জমিদারের সম্পত্তি নিলামে কিনেছে তাঁরই কর্মচারী, রাজা হয়েছে ফকির, শয়তান শাসক; তাদেরই সহচর হিসাবে দেখা দিয়েছে ষড়যন্ত্রীর দল। ইংরেজ বানিয়া কখনো শক্তির সাহায্যে, কখনো রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতাকে তীব্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়েছে অবাধে। তাদের কৌশল ও চক্রান্ত এবং বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতার পরিণামই পলাশীর যুদ্ধে প্রতিফলিত। নতুন গজানো জমিদার, নিত্য চালানো অত্যাচার, নিম্নগামী জীবনযাত্রা আর বাংলার অর্থ বাংলার বাইরে ও বিদেশে চলে যাওয়ায় বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন অষ্টাদশ শতকে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—নিঃস্বতার প্রান্তদেশে এসে পৌঁছেছিল সাধারণ বাঙালী।

লোকসাধারণ যখন এই দুর্দিন, এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে এক শক্তিমতী মাতৃকাশক্তির আশিস ও বরাভয় চেয়েছে, তন্ত্রোক্ত ভয়ঙ্করী কালী তাদের মানস-আসনে আপনার স্থান সংগ্রহ করে নিয়েছে। শাক্তপদাবলীর জন্ম সম্ভব হয়েছে এভাবে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের সুমধুর সঙ্গীতে বাঙালী পেয়েছে শান্তি ও শক্তি—জীবন ধারণের প্রেরণা।

অন্য দিকে হৃতসর্বস্ব জমিদার বা রাজকুমার অথবা রাজ-অমাত্য আপনার মানসিক শান্তি খুঁজে পেতে এই দেবীরই আশ্রয় নিয়েছেন,—হৃদয়ের বেদনা দিয়ে রচনা করেছেন শ্যামাসঙ্গীত। আবার সে সঙ্গীতের সমঝদার যেমন সাধারণ বাঙালী তেমনি এই 'হঠাৎ নবাবে'র দল। মা-কালীর 'কারণ বারি' তাঁদের শক্তিপূজায় আকৃষ্ট

করেছে আর শাক্তসঙ্গীতের মধুরতা পৃষ্ঠপোষকতায় প্রেরণা জুগিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত শাক্তসঙ্গীতের রচনা ও বিকাশে এঁদের সাহায্যও কম ছিল না।

বাঙালীর এক-একটি প্রথা বা আচার এক একসময়ে বাঙালী জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এমনই একটি প্রথা কৌলীন্য প্রথা। কুলীন সন্তানের শতাধিক বিবাহে, পরলোকের যাত্রীর সঙ্গে বালিকার বিবাহে, এবং 'গৌরীদানে'র পুণ্য অর্জনে সাত বৎসরের বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ প্রথায় অষ্টাদশ শতকে উচ্চবর্ণের পরিবারে ও সমাজে একটি শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। বিবাহিতা কন্যার জন্য পিতা-মাতার আর্তি ও বেদনা সমাজের কাছে কোনো সমবেদনা পায়নি, রূপ পেয়েছে আগমনী ও বিজয়া গানে। হিমালয়-মেনকা-উমা বাঙালী পিতা-মাতা-কন্যারই প্রতিরূপ। আগমনী-বিজয়া গানে বাঙালী সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। মেনকা যখন বলেন

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না।

'সিদ্ধিতে নিপুণ' 'অতি বড় বৃদ্ধ' জামাতার প্রতি বাঙালী শাশুড়ির ক্ষোভ অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হয়।

রামপ্রসাদ

কবিপরিচয়

শাক্তগীতির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। 'প্রসাদী সুর' তাঁরই স্মৃতি বহন করে। নিরাভরণ কবি যে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রমাণ চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের রচনা। আনুমানিক ১৭২০-২১ খ্রী. চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহরে তাঁর জন্ম, তিরোধান ১৭৮১ খ্রী.। পিতা রামরাম সেনের দুই বিবাহ। দ্বিতীয়া স্ত্রীর তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ। পিতার মৃত্যুতে যৌবনের প্রারম্ভেই জীবিকা সংগ্রহে রামপ্রসাদ কলকাতায় এক ধনীর গৃহে মুহুরীর কাজে যোগ দেন। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দীভাষায় ইতিপূর্বেই কিছুটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। হিসাব লেখায় তাঁর মন ছিল না, হিসাবের খাতায় গান লিখতেন ('আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই, মা শংকরী' ইত্যাদি)। এই অপরাধে চাকুরি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ জমিদার দিলেন চাকুরি থেকে মুক্তি আর মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি। সাধন

ভজন ও সঙ্গীতরচনার জন্য অফুরন্ত সময় মিলল। তিনি সে-কাজে সিদ্ধকামও হলেন।

রচয়িতা ও গায়ক দু-হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। সে সুনাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কানেও গেল। তিনি চাইলেন রামপ্রসাদ তাঁর সভাকবি হোন। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেলেন রামপ্রসাদ। কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন না, আনন্দিত মনেই একশ' বিঘা নিষ্কর জমি দান করলেন তাঁকে। তবু দারিদ্র্যকে জয় করতে পারেননি রামপ্রসাদ। যাঁর 'হৃৎকমলে মঞ্চদোলে করাল-বদনী শ্যামা/মন-পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ও মা' তিনি আজীবন সাংসারিক হিসাব-নিকাশের ঊর্ধ্বে থেকে গেলেন।

কবিপ্রতিভার পরিচয়ঃ

রামপ্রসাদ প্রায় তিনশ' গান রচনা করেন। তাঁর সঙ্গীতগুলিকে চারটি বিভাগে ভাগ করা যায়—১. আগমনী ও বিজয়া গান ২. তন্ত্রোক্ত সাধন সংক্রান্ত ৩. দেবীর মহিমা বিষয়ক এবং তত্ত্ব ও নীতিবিষয়ক।

আগমনের সম্ভাবনা এবং আগমন হেতু আনন্দ জ্ঞাপক যে গান তা-ই আগমনী গান। আর প্রস্থানজনিত বেদনার সুর যে গানের মধ্যে ধ্বনিত তা-ই বিজয়া-সঙ্গীত। কল্পিত হয়েছে, হিমালয়-কন্যা উমা সপুত্র-কন্যা শারদ ষষ্ঠীতে মাত্র তিন দিনের জন্য কৈলাশ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে আসেন। দশমীতে ফিরে যান কৈলাশে। তাঁর আগমন-সম্ভাবনায় মাতা মেনকার মনে আশা জাগে, আগমনে হৃদয় হয় আনন্দেপূর্ণ। কিন্তু নবমীতেই বিষাদের ছায়া নামে, মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয় আসন্ন কন্যা বিচ্ছেদের সম্ভাবনায়। অতঃপর দশমীতে শুধুই হাহাকার, বৎসরান্তে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে উমা মাতাকে কাঁদিয়ে ফিরে যান কৈলাশে। এই কাহিনীর পটভূমিতেই রচিত হয়েছে আগমনী-বিজয়া গান। 'গিরি এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না' ইত্যাদি উমাসঙ্গীত। এ সঙ্গীতের আদি রচয়িতা রামপ্রসাদ।

তন্ত্রের নিগূঢ় সাধনাকে রামপ্রসাদ সরল গ্রামীণ ভাষায় রূপ দিয়েছেনঃ

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন করো না রে।
ও মন-ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস
শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥

রূপায়িত। মঙ্গলকাব্যে চিত্রিত শিবপার্বতীর আখ্যান এখানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত।

মেনকার একমাত্র কন্যা উমা, বড় আদরে লালিতা-পালিতা। বালিকা বয়সেই তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে জাতিতে কুলীন বয়োবৃদ্ধ শিবের সঙ্গে। দরিদ্র শিবের ঘরে উমার সতীনের সংসার। তাঁর পুত্রকন্যাও অনেকগুলি। ততোধিক, শিব সংসারে উদাসীন। সুতরাং দারিদ্র্যে জর্জর হরগৌরীর পরিবারে সুখের আশা অস্তমিত। বড় আদরের দুলালী উমার কষ্টের কথা ভেবে মেনকার মন সদাভারাক্রান্ত। স্বপ্নে তিনি দেখেন সাধের কন্যা এসেছেন তাঁর কাছে। তাঁর দুর্ভাবনা বাড়ে। এদিকে কন্যার বিষয়ে গিরিরাজও তেমন খোঁজ খবর নেন নি। তাঁর সে উদাসীনতা কঠোর হয়ে বাজে মেনকার বুকে। তাঁর আর্তক্রন্দন অনুরোধে রূপান্তরিত হয়—'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার বড় কেঁদেছে।' তাঁর ক্ষোভ স্বামী ও কন্যার উপর। কুলীন বলে বৃদ্ধ ভাঙড় শিবকে সুপাত্র বিবেচনা করেছেন স্বামী। উমাও তো বোঝে না মায়ের দুঃখ। অবশেষে শরৎ আসে পিতৃগৃহে কন্যার আগমন সম্ভাবনা নিয়েঃ

আমি দেখেছি স্বপন যেন উমাধন
আশাপথ চেয়ে রয়েছে।

গিরিরাজকে তিনি বলেনঃ

আছে কন্যাসন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়া মায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে।

পত্নীর অনুরোধে গিরিরাজ আনেন সপুত্র কন্যা উমাকে—'গিরিরাণী এই নাও তোমার উমারে। ধর ধর হরের জীবনধন।' প্রতিবেশীরা সবাই বলে

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদমুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।

ইতিমধ্যে মেনকা অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেনঃ

গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না।

শরতের আকাশে মেঘের স্থায়িত্বের মতন মা-মেয়ের মিলনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নবমী নিশি পোহালেই উমা ফিরে যাবেন স্বামীর ঘরে। কন্যার জন্য মায়ের দুঃখ-কাতরতা প্রকাশের অভিনব পন্থা মূর্ত হয় মেনকার কথায়ঃ

বুঝাব মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, বুঝবি তখন আপনি ঠেকে॥

মেনকার অশান্তকামনা উপেক্ষা করে নৈসর্গিক নিয়মে নবমী নিশি গত হয়। এবার উমার প্রস্থানের পালা। দুঃখের বাঁধভাঙা আর্তনাদে মেনকা বলে ওঠেন ঃ

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি—
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।
এইখানে দাঁড়াও উমা বারেক দাঁড়াও মা
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।

মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ও শূন্যতা প্রকাশ পায় বিজয়া সঙ্গীতে।

আগমনী-বিজয়ার গানে শ্যামাসঙ্গীতের মতো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অথবা জগজ্জননীর মহিমা প্রকাশের চেষ্টা নাই। শ্যামাসঙ্গীত মূলত সাধনসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত সাধনা-নিরপেক্ষ মানবীয় ভাবগৌরবে সমৃদ্ধ। তবু উভয়েই শাক্তপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ শক্তিউপাসকের দৃষ্টিতে শ্যামা-উমা এক ও অভিন্ন।

অপত্যস্নেহের অপূর্বসঙ্গীত উমাসঙ্গীত। বাঙালীর অনুভূতিপ্রবণ মনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কিন্তু কল্পনার দূরাভিসারে এর জন্ম নয়। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার এক বিষাদঘন পরিণতি বাঙালী সমাজের প্রতিচ্ছবিরূপে ফুটে উঠেছে উমাসঙ্গীতে। সামাজিক প্রতিষ্ঠার লোভে 'অতি বড় বৃদ্ধে'র সঙ্গে বালিকার বিবাহ, কুলীন স্বামীর শতাধিক বিবাহ এবং 'গৌরীদানে'র পুণ্য অর্জনের জন্য বালবিবাহ তৎকালীন সমাজে যে দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তারই এক করুণ চিত্র গানগুলিতে। নাবালিকা কন্যার সপত্নী জ্বালা, দারিদ্র্যভস্মলেপিত কুলীনের ঘরে চরম অনটনে দিনযাপন, মায়ের প্রাণে যে দুর্ভাবনার সৃষ্টি করত তারই প্রতিফলন মেনকা চরিত্রের বেদনাবিহ্বলতায়। গিরিরাজ যেন বাঙালী পরিবারের কর্তা, অদৃষ্ট ও সামাজিক প্রথায় বিশ্বাসী নিশ্চেষ্ট পুরুষ। দুর্গোৎসবের তিন দিনব্যাপী সমারোহ ও আনন্দোচ্ছল পরিবেশ মিশে গেছে বিবাহিত বাঙালী-কন্যার বৎসারান্তে তিন দিনের (অথবা স্বল্প দিনের জন্য) পিতৃগৃহে আগমনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে। আর কন্যার বিচ্ছেদে মাতৃহৃদয়ের আর্তি সে-তো যুগ-নিরপেক্ষ চিরকালীন সত্য। বিজয়া গানে তারই পরিচয়। ঘটনা ও কল্পনার বিচিত্র মিলনে উমাসঙ্গীত বাঙালী জীবনের অপরূপ ছবি।

বাউল সঙ্গীত

বাউল নামক ধর্মসম্প্রদায় রচিত সাধনসঙ্গীতের নাম বাউল সঙ্গীত। লোকসঙ্গীত হিসাবেই তা চিহ্নিত। বাউলরা নিজেদের সাধনতত্ত্ব ও পদ্ধতি রূপকের মধ্য দিয়ে গানে প্রকাশ করেন। রূপকের আবরণের উদ্দেশ্য যাতে নিজ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ছাড়া অন্যের কাছে তা গোপন থাকে। একতারা, ডুগি, কখনো দোতারা, খমক, খঞ্জনি সহযোগে এই গান গীত হয়। গানে নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত হয় বলে গায়কের পায়ে থাকে ঘুঙুর। বাংলার লোকসঙ্গীতধারায় বাউলসঙ্গীত একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে বাংলা দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখা সহজযান। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাই চর্যাগীতির রচয়িতা। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়ামতের উদ্ভব। এই ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত হয় সুফী মতবাদ। চৈতন্যের ধর্মমত দ্বারা আবার পূর্বোক্ত ধর্মমত প্রভাবিত হয়। এরই পরিণামে সপ্তদশ শতক নাগাদ বাউল নামক একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত ও একটি ধর্মসম্প্রদায় দেখা দেয়। বাউল সঙ্গীত এঁদেরই অধ্যাত্মসাধনার কথা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী বাঙালীরাই বাউল সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে থাকেন।

বাউলদের জাতিভেদের বালাই নাই ঃ

তাই তো বাউল হইনু ভাই
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবিদাওয়া নাই।

বাউলরা বিশ্বাস করেন মানুষের 'দেহভাণ্ডই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক', 'মনের মানুষ' 'সাঁই' (স্বামী) আছেন দেহের অভ্যন্তরে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখির' মতো। তাঁকে জানা, তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রেম হওয়াতেই জীবনের পরম সার্থকতা। গৃহী বা সন্ন্যাসী যে-কোনভাবেই এই সাধনা সম্ভব। এই সাধনার জন্য তীর্থে যাওয়াও অপ্রেয়োজনীয় ঃ

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ নারে মন চেয়ে,
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে আবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে।

আসলে কায়াসাধনাই বাউলের উদ্দেশ্য। অন্যকিছুতে তাঁরা বিশ্বাসী নন ঃ

মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে
তোর নাই জ্ঞান নয়ন,
ওরে অবোধ মন
সে মানুষ রতন
তুই চিনবি কিসে।

কারণ, মনের মানুষের অবস্থান যে এই দেহের মধ্যেই ঃ

করে স্থান স্থিতি এই মানুষেতে
পলকেতে যায় পলকেতে আসে।

প্রচলিত ধর্মমতে বাউলদের পূর্ণ অবিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন প্রেমহীন আচার, প্রথা বা শিক্ষা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ঃ

বেদে কি তার মর্ম জানে
যে রূপ সাঁই এর লীলা খেলা
আছে এই দেহ ভুবনে।

আসলে প্রেমের পরাকাষ্ঠাই বাউলের আকাঙ্ক্ষিত। বাউল অর্থ ব্যাকুল বা মাতোয়ারা হওয়াই হোক অথবা ঈশ্বরের সেবকই হোক [আউল (আরবী) অর্থ ঈশ্বরের একাগ্র সেবক] তাদের মূল উদ্দেশ্য পার্থিব কামনা-বাসনাকে তুচ্ছ করে দেহে নিহিত 'নিরাকার', 'প্রাণপাখীর' প্রেমে মগ্ন হওয়া ও তার স্বরূপ জানা।

বাউল সঙ্গীতে বাউলদের এই ধর্মমত এবং সাধনার উপায়ই ব্যক্ত। কিন্তু বাঙালী সমাজে বাউলগানের প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী। 'পাশাপাশি থাকিলেও হিন্দু-মুসলমান দুই দলের পণ্ডিত চেষ্টা করিয়া কিছুতেই দুই ধারাকে মিলাইতে পারিলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দল উভয় সাধনার মানরক্ষা করিলেন।" (ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার বাউল) সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদের উচ্ছেদে বাউলগান একটি স্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছে। লালন বলেছেন

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে।

বাউলগানে মুগ্ধ সাক্ষর-নিরক্ষর বাঙালী লালনের সে কবিচেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সঞ্জীবনীমন্ত্র পেয়েছে সে-জাতীয় গানের মধ্যে। সাধনপদ্ধতির অতিরিক্ত এই লাভই বাউলগানের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

বাউল গান প্রধানত নিরক্ষর বাউলের রচনা। গুরু, বা নিজ গোষ্ঠী অথবা স্বরচিত গানের মাধ্যমে সাধনা, বাউলের লক্ষ্য। গুরু-শিষ্য উভয়েই নিরক্ষর সুতরাং গানের রূপক বেদপুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়নি, গোষ্ঠীর রূপক অথবা লোকজীবন থেকে আহৃত হয়েছে। এই আহরণ অনেক সময় কৌতূহলোদ্দীপকও বটে ঃ

যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেলগাড়ী।

অথবা, মন যদি চড়বি রে সাইকেল

বাস্তব জীবন থেকে আহৃত উপমান। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ বাউল গান। এই ধর্মগোষ্ঠী জনসংখ্যায় যত কম হোক না কেন, সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাদের গানের প্রভাব প্রসারিত। এই গানগুলি থেকে বাঙালী সংগ্রহ করেছে রূপক, বাঙালী কবি অনুপ্রেরণা। ভাষায় মার্জনার অভাব সত্ত্বেও বাঙালীপ্রাণে তা সাহিত্যের স্বাদ দিতে পেরেছে—এইখানেই বাউলগানের প্রকৃত সার্থকতা! রবীন্দ্রনাথও বাউল গানের প্রভাবের দ্বারা ঋণী এবং তাঁর দ্বারাই এই গানগুলির প্রতি আধুনিকমনা বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এবং সেই সূত্রে বিশ্ববাসীর গোচরে এসেছিল এই সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের কথা। বাউলগান সম্পর্কে তাঁর ধারণাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়, 'বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করচে', বাউল গানে আছে তার পরিচয়।

লালন ফকির

বাউল কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য লালন ফকির। ভক্তি, কবিত্ব ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে তাঁর গানে, যেগুলি কবিতা হিসাবেও গ্রহণীয়। রবীন্দ্রনাথ এঁর গানের ভাব ও ভাষায় বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বিদ্বজ্জনের কাছে তাঁকে পরিচিত করিয়েছিলেন।

কবি পরিচয় ঃ

লালন ফকিরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর আনুমানিক জন্মসাল ১৭৭৪ খ্রীঃ। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তিনি দীর্ঘজীবিত ছিলেন। কিন্তু সঠিক জন্মসালের অভাবে জানা যায় না এত দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন কিনা। তিনি হিন্দু না মুসলমান কি ছিলেন তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। একটি প্রচলিত অপ্রমাণিত কাহিনী কায়স্থ বংশীয় কবি বিবাহিত জীবনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে পথের মধ্যে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। এক সহৃদয় মুসলমান দম্পতির সেবায় সুস্থ হয়ে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তাঁর চেহারার বিকৃতি এবং তাঁর সম্পত্তিতে আত্মীয়দের লোভ পূর্বপরিচয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। তীর্থযাত্রী তাঁর

সঙ্গীরাও তিনি মৃত বলেই ঘোষণা করেছিল। নিরূপায় লালন সিরাজ সাঁই-এর কাছে ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং লালন শাহ ফকির নামে পরিচিত হন। কুষ্টিয়ার সেঁউড়িয়া গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করে তিনি সেখানেই সাধনভজন করতে থাকেন। মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ের মহিলা মতিজান বিবির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কবিপ্রতিভার পরিচয় :

হিন্দু বৈষ্ণব ও ইসলাম সুফী, উভয় মতবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। তাঁর গানেও আছে উভয় ধর্মের কথা :

১. আত্মরূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদবেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা।।

২. তার মনে সুমতি দিলে, কুমতি তার গেল দূরে,
আউলিয়া নাম খাতায় লিখিলে, জানা গেল এ রহিম।

কবিত্ব ও ধর্মতত্ত্বের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর রচিত সঙ্গীতে :

১, কথা কয় রে
দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না।

২. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে সে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম তার পায়।

সর্ব সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে তাঁর মতবাদ :

ভক্তি দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে'
তার কাছে জাতের বিচার নাই।

তাঁর রচিত প্রায় পাঁচশ গানের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'লালন গীতিকা' সংগ্রহ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ৪৬২টি গান। রবীন্দ্রনাথ প্রথম এঁর গান সংগ্রহে

মনোনিবেশ করেন এবং ২৯৮টি গান সংগ্রহ করেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩২২ সাল) ২০টি গান প্রকাশের মাধ্যমে তিনি লালনের অমর সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় ঘটান সুধীমণ্ডলীর।

বাউল কবি হিসাবে লালনের লক্ষ্য ছিল জীবাত্মা পরমাত্মা সম্পর্কে বাউল সম্প্রদায়ের মত-প্রকাশ। কিন্তু সরল অথচ ব্যঞ্জনাময় ভাষায় লালন সেই তত্ত্বকথাকেই উৎকৃষ্ট কবিতা-সঙ্গীতের রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত উপমা-প্রতীক-রূপক লোকায়ত জীবনধারা থেকে আহৃত বলে অশিক্ষিত জনের কাছেও তা অন্তত আংশিক বোধগম্য। তাঁর গানে অশিক্ষিতজন পায় ধর্মকথা, শিক্ষিতজন পায় কাব্যসুষমা। মুক্তমনা কবি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বাইরেও বাঙালীর একান্ত আপনজন হয়ে ওঠেন।

● অনুচর্চা

প্রথম অধ্যায়

১. বাঙালী জাতির উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. বাংলাদেশে আর্য-আগমন কবে থেকে ও কিভাবে শুরু হয়েছিল? তার আগে এখানে যে সব জনগোষ্ঠী বাস করত তাদের পরিচয় দিয়ে বাঙালী জাতি গঠনে এইসব জনগোষ্ঠী কতটা সাহায্য করেছিল আলোচনা কর।

৩. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. বাংলা সাহিত্যকে কটি যুগে ভাগ করা যায়? প্রতিটি যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. চর্যাপদ কি? এই পদগুলি কারা রচনা করেছেন? এই পদগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. চর্যাপদে চিত্রিত সমাজজীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

১. বাংলা দেশে তুর্কী আগমনের ফলশ্রুতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. তুর্কী আক্রমণের পরে বাঙালীর সমাজজীবনে ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গুরুত্ব দেখাও। (উ. মা. '৮৩)

২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি কার লেখা? কাব্যখানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বাংলা ভাষায় এই কাব্যখানার বিশেষ মূল্য আছে কেন? কাব্যখানার অন্য কোনো নাম ছিল কি? (উ. মা. '৮১)

৩. বড়ু চণ্ডীদাস কে? তাঁর রচিত কাব্যখানির নাম কি? কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ ভাষায় রচিত ? তাঁর জীবনী ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। (উ. মা. '৭৮)

৫. বিদ্যাপতির পদাবলীর রচনাবৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর। (উ. মা. '৮২)

৬. বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বাংলাদেশে তাঁর পদাবলীর সমাদরের কারণ কি ? (উ. মা. '৮৪)

৭. বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে চন্ডীদাসের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (উ. মা. '৮০)

৮. চন্ডীদাসের পদাবলীর রচনাবৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর। (উ. মা. '৮২)

৯. বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের রচনাবৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

১০. ব্রজবুলি ভাষার বৈশিষ্ট্য কি ? এই ভাষার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল ? বিদ্যাপতি কি এই ভাষায় পদ রচনা করেন ? তাঁর রচিত পদের দু-একটি পংক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১. কৃত্তিবাস কে ছিলেন ? তাঁর রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ লেখ। (উ. মা. '৭৮)

২. কৃত্তিবাসের জীবন ও তাঁর কাব্যরচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। (উ. মা. '৮৪)

৩. কৃত্তিবাস কার লেখা কোন্ কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন ? কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্ষেপে লেখ। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ কি সংক্ষেপে বল। (উ. মা. '৮২)

৪. বাংলা রামায়ণের আদি কবি কে ? কবির পরিচয় ও কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে যেসব উল্লেখ ঐ রামায়ণে রয়েছে তা বিবৃত কর। বাঙালী জীবনে এ কাব্যের প্রভাব কতখানি নির্ণয় কর। (উ. মা. '৮০)

৫. ভাগবতপুরাণের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেছিলেন তার উল্লেখ কর। তাঁর জীবন ও কাব্য সম্পর্কে যা জান, তা লিখ। (উ. মা. '৭৯)

৬. 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যখানির রচয়িতা কে ? তাঁর জীবনী ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭. কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১. কোন সামাজিক পরিবেশে মঙ্গলকাব্য রচনা সম্ভব হয়েছিল তার পরিচয় দাও।

২. মঙ্গলকাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবনের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

৩. মঙ্গল শব্দটির অর্থ কি ? মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? (উ. মা. '৮২)

পঞ্চম অধ্যায়

১. মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ ? এই কাব্যে চাঁদসদাগরের চরিত্র কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা লেখ। (উ. মা. '৭৯)

২. মনসামঙ্গল কাব্যের যে কোনো একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। (উ. মা. '৮২)

৩. মনসামঙ্গল রচয়িতা যে-কোনো একজন বিশিষ্ট কবির সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। (উ. মা. '৮৪)

৪. কবি বিজয় গুপ্ত অথবা নারায়ণ দেবের জীবনী ও কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের কি প্রভাব অনুভব করা যায়, তা আলোচনা কর। (উ. মা. '৭৯)

২. বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কতটা পড়েছিল লেখ। (উ. মা. '৮১, '৮৩)

৩. বাঙালী সমাজজীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয় দিয়ে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তা দেখাও। (উ. মা. '৭৮)

২. কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর দুঃখপূর্ণ ব্যক্তিজীবনের পরিচয় দাও। চরিত্রাঙ্কনে ও করুণরস সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ. মা. ৮০)

৩. চন্ডীমঙ্গল কাব্যের যে কোনো একজন শ্রেষ্ঠ কবির কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। (উ. মা. '৮২)

৪. চন্ডীমঙ্গল রচয়িতা যে কোনো একজন বিশিষ্ট কবির সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। (উ. মা. '৮৪)

অষ্টম অধ্যায়

১. শ্রীচৈতন্যের বাংলাভাষায় রচিত মুখ্য চরিতগ্রন্থগুলির উল্লেখ করে কোন্‌খানিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর, কারণসহ তা আলোচনা কর। (উ. মা. '৭৮, '৮০)

২. দুটি প্রধান চৈতন্য-চরিত কাব্য নিয়ে সংক্ষেপে লেখ। (উ, মা. '৮৩)

৩. বাংলাভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতকাব্য কোন্‌টি ? কাব্যটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্য চরিতকাব্যের 'ব্যাস' বলার কারণ কি ? এই কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৫. জয়ানন্দ ও লোচন দাসের চৈতন্য চরিতকাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

১. চৈতন্য-পরবর্তী দুই বিখ্যাত পদকর্তার কবিকৃতিত্ব লেখ। (উ. মা. '৮৩)

২. বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ দাসের বিশেষত্ব কি ? তাঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলে উল্লেখ করবার কারণ কি তা আলোচনা কর। (উ, মা. '৭৯)

৩. কোন্ ধরনের পদরচনায় গোবিন্দদাসের দক্ষতা লক্ষ্য করা যায় ? তাঁর কাব্যপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (উ. মা. '৮২)

৪. জ্ঞানদাসের কবিকৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তাঁকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন তা আলোচনা কর।

৫. জ্ঞানদাস কোন্ জাতীয় পদরচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁর রচিত পদ আলোচনা করে তা দেখাও।

৬. কোন্ ধরনের পদ রচনায় বলরাম দাস বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত পদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

১. ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

২. কবি রূপরাম চক্রবর্তী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কবিকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪. ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে ? তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

১. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে ? তিনি কোন্ কোন্ পর্ব অনুবাদ করেন ? তাঁর জনপ্রিয়তার কারণগুলির উল্লেখ কর।

২. কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতকে জাতীয় কাব্য আখ্যা দেওয়া যায় কেন ? তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩. সমগ্র মহাভারত অনুবাদ না করলেও অনূদিত মহাভারতের রচয়িতা হিসাবে কাশীরাম দাসের নাম উল্লেখ করা হয় কেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনপরিচয় দাও।

৪. কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

১. আরাকান রাজসভার দুই কবি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. দৌলত কাজীর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. কবি আলাওলের জীবনী ও কবিপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১. কোন্ সামাজিক পটভূমিতে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত হয়? অন্নদামঙ্গলে চিত্রিত সমাজজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২. কবি ভারতচন্দ্রের জীবনী ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

১. কোন্ সামাজিক পরিবেশে শাক্তপদাবলী রচিত হয়েছিল সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. শাক্ত পদাবলী বলতে কোন্ জাতীয় সঙ্গীতকে বোঝায়? এই জাতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ আলোচনা কর।
৩. রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪. কবি কমলাকান্তের জীবনী ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা কর।
৫. বাউল গান কি? এই জাতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর।
৬. বাউল কবি লালন ফকিরের জীবনী ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road